মানব দানব

হেমেন্দ্রকুমার রায়

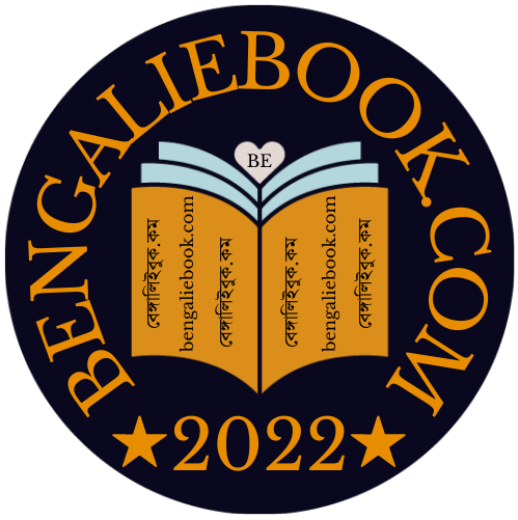

মানব দানব

প্রথম । রহস্যময় বাড়ি

যাকে বলে মিশুকে লোক, অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু সে-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না।

কেউ তাকে হাসতে দেখেনি। রোগা-সোগা লম্বাটে চেহারা, সর্বদাই গম্ভীর মুখে থাকেন, কথাবার্তা কন খুবই কম। তবু লোকে তাকে অপছন্দ করে না।

তার সহ্যশক্তি ছিল যথেষ্ট। যখন কোনও আসরে গিয়ে বসতেন, কোনওরকম অন্যায় কথা বা যুক্তিহীন তর্কই তাকে বিচলিত করতে পারত না।

অতিগম্ভীর মুখে তার শান্ত ও মিষ্ট চোখ দুটি সকলকে আকর্ষণ করত। নিজের প্রকৃতির মাধুর্যকে তিনি চেহারায় ও কথাবার্তায় প্রকাশ করতে পারতেন না বটে, কিন্তু সেটা বিশেষরূপে ফুটে উঠত তাঁর অনেক সদয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে।

কারণে বা অকারণে অবিনাশবাবুর মন যেদিন কিঞ্চিৎ খুশি থাকত, সেদিন এক পেয়ালার পরেও তিনি আর এক পেয়ালা চা পান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। এবং সেদিন দ্বিতীয় পেয়ালা চা পান করতে করতে তিনি নিজের কথাবার্তার মাত্রাও বেশ কিছু বাড়িয়ে না ফেলে। পারতেন না।

তিনি সহজে কারুর সঙ্গে মিশতেন না, কিন্তু এক দিন যার সঙ্গে মেলামেশা করতেন, সে হয়ে থাকত তাঁর চিরদিনের বন্ধু।

এর ঠিক উলটো প্রকৃতি ছিল তাঁর বন্ধু সদানন্দবাবুর। তাঁর মুখও যেমন, কথাবার্তাও তেমনি সর্বদাই হাসিখুশিমাখা। সামাজিকতায়, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায় ও নানারকম গল্পগুজবে তিনি ছিলেন যাকে বলে অদ্বিতীয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হত না যে, অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবুর স্বভাবের মিল আছে কোথাও। অথচ এরা দুজনেই

ছিলেন দুজনের বিশেষ বন্ধু। সরস ও নীরস চেহারার ভিতরে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব দেখা যায় না সচরাচর।

তাদের একটা মস্ত অভ্যাস ছিল। সেটা হচ্ছে দুই বন্ধুতে মিলে কলকাতার পথে-বিপথে বেড়িয়ে বেড়ানো। তারা যখন বেড়িয়ে বেড়াতেন তখন দেখলে মনে হত, তাঁদের দুজনেরই ধাত বুঝি একই রকম! দুজনেই গম্ভীর, বোবার মতন নির্বাক। পৃথিবীর কোনও কিছুর দিকেই যে তাঁদের প্রাণের টান আছে এবং তারা যে পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন, এ কথা তাদের মুখ দেখে বোঝা অসম্ভব ছিল। অথচ সন্ধ্যার সময়ে দুজনে মিলে একটিবার বেড়িয়ে আসতে না পারলে দুই বন্ধুরই প্রাণ যেন ছটফট করতে থাকত।

ব্লটিংয়ের ওপরে কালির ফোঁটা যেমন ক্রমেই বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আজকাল কলকাতা শহরের আকারও তেমনি বড় হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক-একটি এমন নতুন পল্লি তৈরি হয়েছে, যার ফিটফাট পরিষ্কার ঝরঝরে রূপ দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। পুরোনো কলকাতা শহরের সঙ্গে এ-পল্লিগুলি যেন কিছুতেই খাপ খায় না। ঠিক যেন কোনও কয়লার মতন কালো ও ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরা একটি মেয়ের গায়ে জড়োয়ার গয়না সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

এই রকমই একটা নতুন তৈরি পল্লির ভিতর দিয়ে সেদিন বৈকালে অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু একসঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে চলেছিলেন। খানিকক্ষণ পরেই তারা একটি অদ্ভুত-আকার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ও-রকম একটা নতুন পল্লির ভিতরে এমন মান্ধাতার আমলের আশ্চর্য বাড়ি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাড়িখানা দেখলেই বোঝা যায়, তার বয়স একশো বছরের কম নয়। এবং গেল পঞ্চাশ বৎসরের ভিতরে সে-বাড়ির গায়ে যে রাজমিস্ত্রি হাত দিয়েছে, এমন প্রমাণও নজরে পড়ে না। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। অথচ তার দোতলায় জানলা আছে মোটে চারটে। একতলায় আছে গুটি-দুয়েক জানলা ও একটি মস্ত সদর দরজা। ফুটপাতের ওপরে বাড়ির সামনে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটি লম্বা রোয়াক একটানা চলে

গিয়েছে। সেই রোয়াকের ওপরে পানওয়ালা, ভুনিওয়ালা ও ফুলুরিওয়ালারা নোংরা দোকান সাজিয়ে বসেছে এবং রাত্রে মুটে ও ভবঘুরেরা সেখানে আরামে গা ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখের স্বপন দেখে। বাড়ির সদর দরজা প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে এবং ইস্কুলের ছেলেরা দরজার কাঠের ওপরে ছুরি দিয়ে নিজেদের নামকে অমর করবার চেষ্টা করে যায়। বাড়ি ও তার বাসিন্দারা এসব অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে।

নিজের বেতের ছড়িটা তুলে এই বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে সদানন্দ বললেন, অবিনাশ, এ বাড়িটা কোনওদিন তুমি লক্ষ করেছ কি?

সদানন্দের কথা শুনে অবিনাশের মুখের ভাব যেন একটু বদলে গেল। তিনি খালি বললেন, কেন বলো দেখি?

এই বাড়ির সম্বন্ধে আমি একটা বেয়াড়া গল্প বলতে পারি। শুনি।

সদানন্দ বলতে লাগলেনঃ

কিছুদিন আগেকার কথা। পুজোর সময় বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম, কলকাতায় যখন ফিরলুম তখন শেষ রাত। ট্যাক্সি করে নিজের বাড়ির দিকে আসছি। পথের পর পথ–নির্জন ও ঘুমন্ত। পথের পর পথ–যেন কোনও অদৃশ্য শোভাযাত্রার আলোর মালা সাজিয়ে গ্যাসপোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পৃথিবীতে যে জীবন্ত মানুষ আছে তা প্রমাণিত করবার জন্যে একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ি পর্যন্ত দেখা দিলে না।

অন্তত একজনও চলন্ত মানুষ দেখবার জন্যে আমার প্রাণ-মন যখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন রাস্তার মোড়ে হঠাৎ দেখতে পেলুম দুটো মূর্তিকে। প্রথম মূর্তিটা মাথায় বেঁটেসেঁটে, খুব তাড়াতাড়ি হনহন করে এগিয়ে আসছে। অন্য মূর্তি হচ্ছে একটি ছোট মেয়ের বয়স আট দশের বেশি হবে না, সে উধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আসছিল। রাস্তার বাঁকের মুখে দুজনেই দুজনের ওপরে গিয়ে পড়ল। ধাক্কা খেয়ে মেয়েটি ফুটপাতের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। অবিনাশ, তার পরের কথা তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না। কারণ, সেই বেঁটে

লোকটা সেই কচি বাচ্ছার গায়ের ওপরে দুই-পা রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর খুব সহজভাবেই তাকে দুই পায়ে হেঁতলে নির্বিকারের মতন আবার পথ চলতে লাগল। মেয়েটি পাড়া কাঁপিয়ে আর্তনাদ শুরু করে দিলে।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। টপ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছুটে গিয়ে তার কোটের গলাটা সজোরে চেপে ধরলুম। কিন্তু তার মুখের পানে তাকিয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। অবিনাশ, সে-মুখ মানুষের মুখ নয়–মানুষের ছাঁচে গড়া সে যেন কোনও অজানা হিংস্র জানোয়ারের মুখ! আমি তার গলা চেপে ধরতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখলে তাও এক ভয়ানক অমানুষিক ভাবে ভরা! কিন্তু আমি যখন তাকে আবার ঘটনাস্থলের দিকে টেনে নিয়ে চললুম, তখন সে আমাকে কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে না।

ঘটনাস্থলে তখন মেয়েটির কান্না শুনে অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়েছে। মেয়েটি এই অসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল পাড়ার এক ডাক্তার ডাকবার জন্যে তার বাড়িতে নাকি কার খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। ডাক্তারকে খবর দিয়ে ফেরবার মুখেই এই কাণ্ড!

ইতিমধ্যে ডাক্তারও এসে হাজির! সব শুনে তিনিও লোকটার দিকে রুখে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝলুম, এই নৃশংস জীবটাকে উচিতমতো শিক্ষা দেবার জন্যে তার হাতদুটো নিশপিশ করছে, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না! পথে এসে যারা জড়ো হয়েছিল তারাও সবাই রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই মূর্তিমান নরপিশাচের চেহারা দেখে তাদের সকলেরই বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল!

আমি লোকটাকে ডেকে বললুম, আপনার মতন পাষণ্ড দুনিয়ায় আমি দুটি দেখিনি! আপনি মানুষের সমাজে থাকবার যোগ্য নন।

লোকটা বললে, মশাই, এই সামান্য একটা দৈব-দুর্ঘটনা নিয়ে আপনারা এত বেশি গোলমাল করবেন না। আপনি কী করতে চান?

আপনাকে নিয়ে থানায় যেতে চাই।

মশাই, থানায় গিয়ে কোনও ভদ্রলোকই মান খোয়াতে রাজি হয় না। কিছু টাকা পেলে যদি আপনাদের সাধ মেটে তাহলে আমি টাকা দিতে রাজি আছি।

আমরা সবাই মিলে স্থির করলুম ক্ষতিপূরণের জন্যে লোকটাকে একশো টাকা দিতে হবে।

টাকার পরিমাণ শুনে লোকটা প্রথমে কিছু ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু সকলের মারমুখো মূর্তির দিকে চেয়ে শেষটা সে রাজি হয়ে গেল। বললে, তাহলে আপনারা আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসুন। আমার বাড়িতে গেলেই টাকা পাবেন।

তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। কিন্তু সে আমাদের কোথায় নিয়ে এল, জানো অবিনাশ? এই বিদঘুঁটে বাড়িটার সামনে! দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে দ্বার খুলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল এবং খানিক পরেই একখানা চেক হাতে নিয়ে ফিরে এল। চেকের তলায় যিনি নাম সই করেছেন, তিনি শুধু আমারই জানিত লোক নন, এই শহরের একজন বিখ্যাত ও মাননীয় ব্যক্তি।

আমি বিস্মিত স্বরে বললুম, মশাই, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। কার চেক আপনি কাকে দিচ্ছেন?

লোকটা বিশ্রীভাবে দন্তবিকাশ করে বললে, আপনাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনাদের সঙ্গে আমি নিজেই গিয়ে চেকখানা ভাঙিয়ে দিতে রাজি আছি।

আমরা তাই-ই করলুম। তাকে নিয়ে তখনকার মতন আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। তারপর যথাসময়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে আমি নিজের হাতে চেকখানা দাখিল করলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছিল এ চেক জাল ও অচল। কিন্তু ব্যাঙ্কে সেই চেক চলল।

অবিনাশ বললেন, হুঁ। তাই নাকি?

সদানন্দ বললেন, হ্যাঁ। তুমিও বোধহয় আমারই মতো আশ্চর্য হচ্ছ? বাস্তবিক, চেকের তলায় যাঁর নাম ছিল, তার মতন মহৎ লোক এমন জানোয়ারের সঙ্গে কখনওই কোনও সম্পর্ক রাখতে পারেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনওরকম ভয়টয় দেখিয়ে এই লোকটা তার কাছ থেকে চেকখানা আদায় করেছিল।

অবিনাশ হঠাৎ গলার স্বর বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন তিনিও ওই বাড়িতে থাকেন কি না, সে-খোঁজ নিয়েছ কি?

সদানন্দ বললেন, ও-বাড়িতে কখনও কোনও ভদ্রলোক বাস করতে পারেন? ও কি ভদ্রলোকের জায়গা? চেকে যিনি নাম সই করেছিলেন, তার বাসা যে অন্য জায়গায়, একথা তো আমি আগে থাকতেই জানি!

এ বিষয়ে তুমি আর কোনও খোঁজখবর নাওনি?

না, নেওয়া দরকার মনে করিনি। তবে এ পথ দিয়ে গেলেই ওই অদ্ভুত বাড়িখানা ভালো করে লক্ষ না করে আমি পারি না। ওটা আমার বাড়ি বলেই মনে হয় না। অত বড় বাড়িতে মোটে ওই কটি জানলা! জানলাগুলো কখনও খোলাও দেখিনি। সদর দরজাটাও সর্বদাই বন্ধ থাকে। মাঝে-মাঝে কেবল সেই বিশ্রী লোকটা ওই দরজা খুলে বাইরে আসে। ও-বাড়িটা যেন রহস্যময়!

খানিকক্ষণ দুজনে নীরবে পথ চললেন। অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে সদানন্দের মনে হল তার বন্ধু যেন কোনও দুর্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

মিনিট কয় পরে অবিনাশ বললেন, সদানন্দ, তুমি সেই বিশ্রী লোকটার নাম জানো?

তিনকড়ি বটব্যাল।

বটে। তাকে দেখতে কীরকম?

তার চেহারার সঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব! তার দেহ দেখতে সাধারণ মানুষেরই মতন, কিন্তু তবু, তাকে দেখলে মোটেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। সন্দেহ হয়, যেন তার দেহের ভিতরে কী একটা মস্ত অভাব থেকে গিয়েছে হয়তো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত! তার মুখের দিকে তাকালেই ভয়ে ও ঘৃণায় বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে। তার চেহারা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে, তা খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই!

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকবার পর অবিনাশ বললেন, আচ্ছা, তিনকড়ি যে নিজের চাবি দিয়েই সদর দরজাটা খুলেছিল, এ-বিষয়ে তোমার কোনই সন্দেহ নেই তো?

সদানন্দ বিস্মিত স্বরে বললেন, এ কীরকম আশ্চর্য প্রশ্ন!

অবিনাশ বললেন, প্রশ্নটা তোমার আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে বটে। চেকে যার নাম সই ছিল, সে-ভদ্রলোককে আমি খুবই চিনি। কিন্তু আমার গোল বাধছে এই তিনকড়িকে নিয়ে। সে কি সত্যিই নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিল?

সদানন্দ বললেন, এই সামান্য চাবির কথা নিয়ে কোথায় যে গোল বাধল, আমি তো সেটা আন্দাজ করতে পারছি না! হ্যাঁ, সে তার নিজের পকেট থেকেই চাবি বার করেছিল।

অবিনাশ বললেন, ব্যস, এ কথা চাপা দাও! উঃ, অনেক কথা কয়ে ফেললুম–এত কথা কওয়া আমার উচিত হয়নি।

.

দ্বিতীয়। তিনকড়ি লোকটা কে?

অবিনাশবাবুর মগজে আজ যে কী পোকা ঢুকেছে তা আমরা বলতে পারি না। একে তো স্বভাবতই তিনি গম্ভীর–আজ সেই গাম্ভীর্যের ওপরে আবার বিরক্তিরও ছায়া এসে পড়েছে।

অন্য অন্য দিন বেড়িয়ে বাড়িতে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন। কিন্তু আজ তিনি সেসব কিছুই করলেন না, বসে-বসে খালি কী যে ভাবতে লাগলেন তা কেবল তিনিই জানেন।

খানিক পরে উঠে দেরাজ খুলে তিনি একতাড়া কাগজ বার করলেন। সেই লম্বা কাগজগুলোর ওপরে লেখা রয়েছে, ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়ের উইল। উইলখানা তিনি এর আগেও কয়েকবার পড়েছিলেন, আজও আর একবার পড়ে দেখলেন। উইলের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই

ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, M.D,D.C.L,LL.D.,ER.S, পরলোকগত হলে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তার উপকারী প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বটব্যাল ভোগ-দখল করতে পারবেন।

কিন্তু ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যদি কখনও তিনমাসের বেশি অদৃশ্য হয়ে থাকেন, তাহলেও উক্ত তিনকড়িবাবু বিনা বাধায় ডাক্তার জয়ন্তবাবুর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন।

উইলখানা পড়তে-পড়তে অবিনাশবাবুর মুখের অন্ধকার আরও বেশি ঘনিয়ে উঠল। এতকাল অ্যাটর্নিগিরি করছেন, কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া উইল জীবনে তিনি কোনওদিনই দেখেননি। মানুষ যে সজ্ঞানে এমনধারা উইল করতে পারে, একথা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না–এ উইলখানা দেখলেই তার চোখ যেন জ্বালা করতে থাকে।

উইলখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে অবিনাশবাবু নিজের মনেই বললেন, এ খালি পাগলামি নয়, ঘৃণার ব্যাপারও বটে।

পরের দিন সকালে উঠে তিনি ডাক্তার করুণাকুমার চৌধুরীর উদ্দেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। করুণাবাবুর মতন বিখ্যাত ডাক্তার শহরে খুব কমই আছেন। করুণা ছিলেন অবিনাশের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু এবং তাদের সে-বন্ধুত্ব আজও অক্ষত আছে।

অবিনাশবাবুর বিশ্বাস, করুণাবাবু ছাড়া আর কেউ খামখেয়ালি জয়ন্ত ডাক্তারের হাঁড়ির খবর দিতে পারবে না– কারণ তারা দুজনে খালি সমব্যবসায়ী নন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে।

অবিনাশবাবুকে দেখে করুণা খুব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। চা পান করতে করতে দুজনে মিলে খানিকক্ষণ একথা-সেকথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, আচ্ছা করুণা, তোমার আর আমার চেয়ে বড় বন্ধু জয়ন্তের বোধহয়। আর কেউ নেই, কী বলো?

করুণা বললেন, এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু হঠাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বলো দেখি? আজকাল তো জয়ন্তের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে।

–তাই নাকি? তোমরা দুজনেই ডাক্তার অথচ তোমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই?

আগে প্রায়ই দেখা হত। কিন্তু গেল কয়বছর ধরে জয়ন্ত ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিনরাত যে সব আজগুবি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর, পাগলের মতন যেসব কথা নিয়ে বক বক করে তার কোনও মানেই হয় না। দেখে-শুনে আমি তার হাল একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি!

অবিনাশবাবু বললেন, ও, বুঝেছি। তোমাদের ভেতরে মতভেদ হয়েছে। আচ্ছা করুণা, তুমি জয়ন্তের নতুন বন্ধু তিনকড়ি বটব্যালকে চেনো?

করুণা ভুরু কুঁচকে বললেন, তিনকড়ি! না, ও নামও কখনও শুনিনি!

করুণার কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু জানা যাবে না বুঝে অবিনাশবাবু আবার বাড়িমুখো হলেন। তিনকড়ির কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে-ঘামিয়ে সে দিনটাই তাঁর বাজে নষ্ট হয়ে গেল। কে এই তিনকড়ি, জয়ন্তের সঙ্গে এমন ছোটলোকের কী সম্পর্ক, তিনি কিছুতেই সেটা আন্দাজ করতে পারলেন না। এমনকী রাত্তিরেও সেই ব্যাপারটা তাঁকে যেন একেবারে পেয়ে বসল। ঘুমোবার জন্যে চোখ মুদেও অন্ধকারের ভিতরে তিনি যেন দেখতে পেলেন সদানন্দের বলা সেই গল্পের ছবিটি নির্জন নিশুত রাত রাস্তায় সার বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছে আলোর থামগুলো; অস্বাভাবিক আকারের একটা ঘৃণ্য মানুষের বদ চেহারা খটখট করে এগিয়ে আসছে; একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে; দুজনের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগল–ছোট মেয়েটি পড়ে গেল, আর সেই বেয়াড়া মানুষটা তাকে দু-পায়ে থেঁতলে পথের ওপরে ফেলে রেখেই আবার চলতে শুরু করল,–অম্লানমুখেই।...তারপর তিনি দেখলেন, তাঁর বন্ধু জয়ন্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। সেই ভীষণ লোকটা অনায়াসেই জয়ন্তের বিছানায় পাশে এসে দাঁড়াল; অসঙ্কোচে জয়ন্তের নাম ধরে ডাকলে; তাঁর বন্ধুর ঘুম ভেঙে গেল, তাড়াতাড়ি উঠে বসে এমন অসময়েও এই ভয়াবহ মূর্তিটিকে ঘরের মধ্যে দেখেও সে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে না! লোকটা তাকে বললে চেক সই করে দিতে এবং জয়ন্তও বিনা বাক্যব্যয়ে তার এই অসঙ্গ ত অনুরোধ রক্ষা করলে!

এই একই কথা নিয়ে তোলাপাড়া করে ক্রমেই তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তবু এ দুর্ভাবনা তাঁকে রেহাই দিলে না। এই তিনকড়ির আসল চেহারার সঙ্গে যদি তার পরিচয় থাকত, তাহলে হয়তো তিনি এতটা অভিভূত হয়ে পড়তেন না! তিনকড়ির প্রকৃতির পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তার বিদকুটে চেহারার বর্ণনাও তিনি শুনেছেন এবং তাকে তিনি সর্বদা চোখের সামনেও দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তার মুখখানা কিছুতেই তাঁর দৃষ্টির সীমার মাঝে আসছে না! শেষটা তাঁর কৌতূহল এতটা বেড়ে উঠল যে তিনি স্থির করলেন, যেমন করেই হোক তিনকড়ি বটব্যালকে তিনি দেখবেনই দেখবেন! হয়তো তার দেখা পেলে তার মনটা আবার হালকা হয়ে যাবে এবং এমন একটা জীবকে কেন যে তার বন্ধু এতটা অন্যায় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, হয়তো এ-রহস্যটাও বোঝা তার পক্ষে শক্ত হবে না!

সদানন্দবাবু যে অদ্ভুত বাড়িটার কথা বলেছিলেন, পরদিন থেকে অবিনাশবাবু তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রোজ নিয়মিতভাবে পাহারা দিতে লাগলেন। এ বাড়ির মালিক কে, সদানন্দবাবু তা জানেন না বটে, কিন্তু অবিনাশবাবু জানেন! এ বাড়ির মালিক হচ্ছেন তারই মক্কেল ডাক্তার জয়ন্তকুমার। এটা তার পরীক্ষাগার। এখানে তিনি নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেন। কিন্তু এখানে তিনকড়ি আনাগোনা করে কেন ও এ-বাড়ির চাবি

তার পকেটেই বা থাকে কেন? নিজের মনের ভিতর থেকে এ-প্রশ্নের কোনও জবাব না পেয়ে অবিনাশবাবু আপনা-আপনিই বললেন, আচ্ছা, আগে তো তিনকড়িকে স্বচক্ষে দেখি, তার পরেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে!

এক দিন, দু-দিন, তিন দিন গেল–তিনকড়ির দেখা নেই। চতুর্থ দিনে অবিনাশবাবুর ধৈর্য সফল হল। তখন রাত দশটা বেজে গেছে, দোকানিরা একে-একে দোকানের ঝাঁপ ফেলছে, রাস্তাঘাট একেবারে নীরব ও নির্জন না হলেও গোলমাল খুব কম। এমন সময় অবিনাশবাবুর কানে এল কেমন একরকম পায়ের আওয়াজ! অন্যান্য পায়ের আওয়াজের সঙ্গে এর যেন কোনওই মিল নেই!

পদশব্দ আরও কাছে এগিয়ে এসে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। অবিনাশবাবু প্রায় রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন, মোড় ফিরে পথের ওপরে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি! খর্ব দেহ, সাজপোশাক সাদাসিধে।

মূর্তিটা রাস্তা পার হয়ে ও-ফুটপাথের সেই বাড়িখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবি বার করলে। অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন এবং হাত দিয়ে তাঁর কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, বোধহয় আপনিই তিনকড়িবাবু?

সাপের মতন শব্দ করে একটা দ্রুত নিশ্বাস টেনে তিনকড়ি সভয়ে পিছিয়ে গেল! কিন্তু তার সে ভয় মুহূর্তের জন্যে, তখনই সে নিজেকে সামলে নিলে! এবং যদিও সে

অবিনাশবাবুর চোখের দিকে আর মুখ তুলে তাকালে না, তবু বেশ শান্ত স্বরেই বললে, হা, ও নাম আমারই, আপনি কী চান?

অবিনাশবাবু বললেন, আমি হচ্ছি ডাক্তার জয়ন্তবাবুর একজন পুরোনো বন্ধু। আমার নাম অবিনাশচন্দ্র সেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন? দেখছি, আপনি এই বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

জয়ন্তবাবু এখানে নেই–এই বলে তিনকড়ি দরজায় চাবিটা ঢুকিয়ে দিলে এবং তার পরে মুখ না তুলেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে?

অবিনাশবাবু বললেন, আপনি দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন?

কেন শুনব না? বলুন।

আপনি এমন মুখ লুকোবার চেষ্টা করছেন কেন? আপনার মুখটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন কি?

তিনকড়ি প্রথমটা একটু ইতস্তত করলে; এবং তারপর যেন হঠাৎ কী ভেবেই অবিনাশবাবুর সুমুখে এসে সিধে হয়ে দাঁড়াল!

কয়েক সেকেন্ড ধরে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অবিনাশবাবু বললেন, এরপর আর আমি আপনাকে ভুলব না। এটা একটা লাভের কথা।

তিনকড়ি বললে, হ্যাঁ। হয়তো আবার আমাদের দেখা করবার দরকার হবে। আমার ঠিকানাটাও রেখে দিন–এই বলে সে একখানা কার্ড এগিয়ে দিলে। কার্ডের ওপরে ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক বাড়ির নম্বর লেখা রয়েছে।

অবিনাশবাবু মনে-মনে বললেন, সর্বনাশ! একি সেই উইলের জন্যেই আমার সঙ্গে দেখা করবার ফন্দি আঁটছে? কিন্তু মনের কথা মুখে তিনি প্রকাশ করলেন না।

তিনকড়ি বললে, এখন বলুন দিকি মশাই, আমাকে আপনি চিনলেন কেমন করে?

লোকের মুখে শুনে। কে

লোক? তার নাম কী?

অবিনাশবাবু কেবল বললেন, এমন কোনও লোক তিনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু।

সচমকে তিনকড়ি বললে, দুজনেরই বন্ধু। কে তিনি?

সন্দেহ হয়, যদিও তার প্রায় বামনের মতে দখলে মনে হয়, তিন্নিরপর চিন্তিত মুখে করে

অবিনাশবাবু বললেন, ধরুন, ডাক্তার জয়ন্ত।

ক্রুদ্ধস্বরে তিনকড়ি বললে, তিনি কখনও আপনাকে বলেননি। আপনি যে মিছে কথা কইবেন এটা আমি জানতুম না।

অবিনাশবাবু বললেন, আপনিও ঠিক ভদ্রলোকের মতন কথা কইলেন না!

তিনকড়ি বন্য জন্তুর মতন অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর আচম্বিতে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে দরজাটা খুলে ফেলে বাড়ির ভিতরে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অবিনাশবাবু কিছুক্ষণ সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। তার মুখ দেখলে মনে হয়, তিনি যেন রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনকড়ি প্রায় বামনের মতো বেঁটে, তাকে দেখলেই তার দেহকে বিকৃত বলে সন্দেহ হয়, যদিও তার দেহে অঙ্গ-বিকৃতির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। তিনকড়ির ভাব ও ব্যবহারও কখনও ভিতু ভিতু, আবার কখনও বা রীতিমতো বেপরোয়া। তার গলার আওয়াজও কেমন যেন ভাঙা ভাঙা ও চাপা-চাপা এবং সে কথা কয় প্রায় চুপিচুপি, কর্কশ স্বরে। এগুলো তার সস্বভাবের পরিচয় দেয় না বটে, কিন্তু তাকে দেখেই তার মনের ভিতরে কেন যে একটা ঘৃণা ও ভয়ের ভাব জেগে উঠেছিল, অবিনাশবাবু তার কোনও হদিস খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হল, তিনকড়িকে দেখে তিনি যেটুকু বুঝেছেন সেইটুকুই তার আসল পরিচয় নয়-তার মধ্যে অমানুষিক একটা কিছু আছে নিশ্চয়! তার দেহের রক্তমাংসের ভিতরে বাস করছে যেন কোনও অভিশপ্ত আত্মা! অবিনাশবাবু আপন মনেই বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! তোমার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত! যে নতুন বন্ধুটিকে তুমি পেয়েছ, তার মুখের ওপরে আমি শয়তানের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

চলতে-চলতে অবিনাশবাবু আর একটা রাস্তায় আর একখানা বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। বাহির থেকেই বোঝা যায় এ বাড়ির ভিতর যিনি বাস করেন, তিনি অশিক্ষিত বা গরিব লোক নন। অবিনাশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। একজন লোক দাঁড়িয়েছিল তাকে ডেকে শুধোলেন, রামচরণ, জয়ন্ত বাড়িতে আছেন?

রামচরণ বললে, আমি ঠিক বলতে পারছি না হুজুর! আপনি বাইরের ঘরে একটু বসুন, বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে আসছি। সে চলে গেল। অবিনাশবাবু সাজানো-গুছানো একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে সোফায় ওপরে বসে পড়লেন।

বড়-বড় চিত্রকরের আঁকা ভালো ভালো ছবি, দামি দামি পাথরের মূর্তি ও আসবাব দিয়ে ঘরখানি চমৎকার রূপে সাজানো। এই ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই সারা মনটি যেন আরামে এলিয়ে আসে। অবিনাশবাবুর মতে, এমন আনন্দদায়ক ঘর কলকাতায় আর দ্বিতীয় নেই! এইখানেই জয়ন্ত ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসে কত সুন্দর সন্ধ্যা তিনি নিশ্চিন্ত প্রাণে কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আজ তার মনের ভিতর থেকে সমস্ত আনন্দের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে! তিনকড়ির মুখ মনে করে জীবনের উপরেও তাঁর যেন বিতৃষ্ণা আসতে লাগল–এবং বার বার তার মনে হতে লাগল, তার বন্ধুর এই ঘরেও সর্বত্রই যেন একটা অদৃশ্য অমঙ্গলের আভাস জেগে আছে।

রামচরণ এসে খবর দিলে, জয়ন্ত কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, সে তা জানতে পারেনি।

অবিনাশবাবু বললেন, আচ্ছা রামচরণ, তোমার বাবু যে পুরোনো বাড়িতে বসে কাজ করেন, তার চাবি তিনকড়িবাবুর হাতে গেল কেমন করে?

রামচরণ বললে, বাবুই তাকে দিয়েছেন।

দেখেছি, ওই তিনকড়ি-ছোকরার ওপরে তোমার বাবুর খুব বিশ্বাস!

হ্যাঁ হুজুর, বাবু তাকে খুবই বিশ্বাস করেন। খালি তাই নয়, বাবু হুকুম দিয়েছেন তিনকড়িবাবু যা বলবেন আমাদের সকলকেই তাই করতে হবে।

আচ্ছা রামচরণ, তোমাদের ওই তিনকড়িবাবুকে আমি বোধহয় এখানে কখনও দেখিনি?

না হুজুর, তিনি বাড়ির এদিকে কখনও আসেন না। খিড়কির দরজা দিয়ে তিনি আনাগোনা করেন।

আমি এখন আসি রামচরণ।

রাস্তায় বেরিয়ে অবিনাশবাবু আবার ভাবতে-ভাবতে চললেন, বেচারা জয়ন্ত! জানি চিরদিনই সে খামখেয়ালি, কিন্তু তার মতন সুচরিত্র ও মিষ্টপ্রকৃতির লোক তিনকড়ির মতন বীভৎস জীবের সঙ্গে মেলামেশা করছে কেমন করে? তিনকড়ি কোন মায়ামন্ত্রে জয়ন্তকে বশীভূত করেছে?..এই তিনকড়ি! নিশ্চয়ই এ যে-জীবন যাপন করে তা ওর চেহারার মতোই ভয়ংকর! সে-জীবনের পরিচয় পেলে জয়ন্ত কখনওই তার সঙ্গে মিশতে পারবে না।...এই নরপশুটা কিনা ঘুমন্ত জয়ন্তের বিছানার পাশে গিয়েও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি সে কোনওগতিকে ঘুণাক্ষরেও উইলের কথা টের পায়, তাহলে জয়ন্তের প্রাণ কি আর একদণ্ডও নিরাপদ থাকবে? এই সমূহ বিপদ থেকে জয়ন্তকে উদ্ধার করতে হবেই! কিন্তু সে কি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে?

.

তৃতীয়। জয়ন্তের কোনও ভাবনাই নেই

দিন পনেরো পর বন্ধুবান্ধবদের কাছে হঠাৎ ডাক্তার জয়ন্তের এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির। এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়, বহুকাল অদর্শনের পর এরকম আকস্মিক ভোজ দেওয়ার খেয়াল ডাক্তার জয়ন্তের অনেকবারই হয়েছে। অবশ্য, এরকম ভোজের আসরে জনকয় বাছা-বাছা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কেউ নিমন্ত্রিত হতেন না।

ডাক্তার জয়ন্তের সঙ্গে এমনভাবে দেখা পাবার সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু খুবই খুশি হয়ে গেলেন। আগেই বলেছি এক পেয়ালার ওপরে দু-পেয়ালা চা খেলেই তার মুখের কুলুপ খুলে যেত–আজকে তিনি দ্বিতীয় পেয়ালার উপরেও তৃতীয় পেয়ালা চা নিয়ে আসর জমকে বসেছেন রীতিমতো। কারণে অকারণে অনর্গল গল্প করে যাওয়া যাদের স্বভাব তারা আজ। যত গল্প করছে, অবিনাশবাবুও তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম করছেন না। সাধারণত স্বল্পবাক ও শুষ্ক প্রকৃতির এই প্রৌঢ় মানুষটিকে বন্ধুরা সকলেই যে পছন্দ করতেন, একথাও আগে জানিয়েছি। সুতরাং আজকের আনন্দসভায় অবিনাশবাবুকে এমন ভোলা প্রাণে যোগ দিতে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

বাবুর্চির হাতে তৈরি প্রন কাটলেট, পটলের দোরমা, রুইমাছের রোস্ট, শ্রীরামপক্ষীর সঝোল মাংস ও মোগলাই পোলাও খেয়ে সকলের মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল সে কথা বলাই বাহুল্য। তারপর খোসমেজাজে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে অন্যান্য বন্ধুরা যখন একে একে বিদায় নিয়ে গেলেন, অবিনাশবাবু তখনও তাঁর আসন ছেড়ে উঠলেন না।

জয়ন্ত বুঝলেন অবিনাশবাবু নিশ্চয়ই তাঁকে কোনও কথা বলতে চান, আর সেকথা নিতান্ত হালকা কথা নয়।

তাকে বেশিক্ষণ সবুর করতেও হল না। অবিনাশবাবু হঠাৎ গম্ভীর মুখে আরম্ভ করলেন, জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমার কাছে তোমার যে-উইল রেখে এসেছ, তার কথা নিশ্চয়ই তুমি ভোলেনি?

জয়ন্ত বললেন, অবিনাশ, তুমি একটি বেচারি! আমার উইল নিয়ে তোমার যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই, সেকথা আমি জানি। আমার মতন নির্বোধ মক্কেল পাওয়া কারুর পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয় নয়! করুণা তো আমার ওপরে চটেই আগুন হয়ে আছে। তার বিশ্বাস, আমার মাথার ঠিক নেই। আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেও সে গাঁজাখোরের খেয়াল বলে মনে করে!

অবিনাশবাবু বললেন, করুণার কথা এখন থাক। তোমার উইলের কথাই হোক। কোনও বুদ্ধিমান লোকই এ রকম উইল করে না।

জয়ন্ত সায় দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, এ কথা তো আমি আগেই স্বীকার করেছি। আমি একটি নির্বোধ মক্কেল।

অবিনাশবাবু বললেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।..কিন্তু জানো কি জয়ন্ত, যার নামে তুমি উইল করেছ, সেই তিনকড়ির কোনও কোনও গুপ্তকথা আমি জানতে পেরেছি?

জয়ন্তের সুন্দর মুখ মড়ার মতন হলদে হয়ে গেল তার চোখের উপরেও কেমন একটা কালো ছায়া নেমে এল। তিনি শুকনো স্বরে বললেন, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না, ও নিয়ে আমি আলোচনা করতেও রাজি নই।

অবিনাশবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, তিনকড়ি যেসব কাণ্ড করে, কোনও ভদ্রলোকেই তা করে না।

জয়ন্ত চঞ্চল ভাবে বললেন, সে যে কাণ্ডই করুক তার জন্যে আমার উইল অদল বদল হবে না। অবিনাশ, তুমি জানো না আমার অবস্থা কতটা সঙিন! এ ব্যাপার নিয়ে বাজে বাক্যব্যয় করলে কোনওই লাভ হবে না।

জয়ন্তের অবস্থা দেখে অবিনাশবাবুর দয়া হল। গলার আওয়াজ নরম করে আবার তিনি বললেন, জয়ন্ত, আমাকে তুমি চেনো। আমাকে তুমি অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারো। আমার কাছে সব কথা খুলে বলো, আমি নিশ্চয়ই তোমার উপকার করতে পারব।

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে-ধীরে বললেন, ভাই অবিনাশ, তুমি যে আমার উপকারী বন্ধু তা কি আমার জানা নেই? আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। তোমার মতন বিশ্বাস আমি পৃথিবীর আর কারুকেই এমনকি নিজেকেও করি না! কিন্তু যতটা ভাবছ ততটা এখনও হয়নি। তোমাকে শান্ত রাখবার জন্যে আমি যা বলছি শোনো। আমি

ইচ্ছা করলে যখন-খুশি এই তিনকড়ির হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারি। সুতরাং তাকে নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই ভালো।

অবিনাশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বেশ, তাই হোক।

জয়ন্ত বললেন, কিন্তু কথা যখন আজ উঠলই তখন আর একটা বিষয় তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই। সত্যসত্যই ওই তিনকড়ি বেচারার ওপরে আমার মনের টান আছে। আমি জানি তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে-সে নিজেই আমাকে একথা বলে গেছে। বোধহয় সে তোমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহারও করেনি। কিন্তু ভাই অবিনাশ, আমি তাকে পছন্দ করি। তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার করো, আমি যখন থাকব না তখন তার উচিত পাওনা তুমি তাকে মিটিয়ে দেবে? তোমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

অবিনাশবাবু বললেন, তুমি যতই বলো, আমি তাকে কখনওই পছন্দ করতে পারব না।

জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবিনাশবাবুর কাঁধের ওপরে একখানা হাত রেখে বললেন, তুমি যে তাকে পছন্দ করতে পারবে না তাও আমি জানি। কিন্তু স্বীকার করো, আমার অবর্তমানে তুমি ঠিক উইল মতো কাজ করবে?

অবিনাশবাবু দুঃখিতভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, স্বীকার করছি।

.

চতুর্থ। হত্যাকাণ্ড

এক বছর পরে। সারা কলকাতা শহরে ভীষণ এক হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ল। এরকম নিষ্ঠুর খুনের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

গঙ্গানদীর কাছাকাছি একটা রাস্তায় এক বাড়ির একটি মেয়ের রাতের বেলায় ঘুম হচ্ছিল না। মেয়েটি ছিল সে-বাড়ির শিক্ষয়িত্রী। সেদিন পূর্ণিমা রাত-জ্যোত্স্নার দুগ্ধময়ী ধারায় চারিদিক ধবধব করছিল। মেয়েটি জানলার ধারে বসে আনমনে পথের দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটির নাম কমলা।

সেইখানে বসে-বসে কমলা সে রাতে যা দেখেছিল তা হচ্ছে এই

একটি বয়স্ক ভদ্রলোক একা পথ চলছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি যখন কমলাদের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন আকাশের জ্যোৎস্না ও পথের গ্যাসের আলোকে তার চেহারা বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল। তার মাথার চুলগুলি রুপোর মতন সাদা, আর মুখখানি এমন শান্ত ও ভাবভঙ্গি এমন ধীর স্থির যে দেখলেই তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

ঠিক সেই সময়েই আর এক দিক দিয়ে একটি যুবক ভদ্রলোক প্রাচীন লোকটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কমলা প্রথমটা তার দিকে ততটা নজর দেয়নি, কিন্তু তার পরে দেখেছিল সে মাথায় অত্যন্ত বেঁটে। তাকে দেখে প্রাচীন লোকটি খুবই বিনীত ও ভদ্রভাবে নমস্কার করলেন।

কমলা তখন ভালো করে বেঁটে লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখে তখনই তাকে চিনতে পারলে। তার নাম হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যাল, সে একবার কী একটা কাজে কমলাদের বাড়ি এসেছিল। কিন্তু তার চেহারা, ভাবভঙ্গি ও কথাবার্তা কমলার এত খারাপ লেগেছিল যে, তাকে সে মোটেই পছন্দ করতে পারেনি।

প্রাচীন ভদ্রলোকটি খুব শিষ্ট এবং মিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে তিনকড়িকে কী বলতে লাগলেন। কিন্তু তিনকড়ির ভাব দেখে মনে হল না যে, তাঁর কথা সে কান পেতে শুনছে। তারপর কোথাও কিছু নেই আচমকা তিনকড়ি মহা খাপ্পা হয়ে লাফালাফি করতে ও হাতের মোটা লাঠিগাছা ঘোরাতে শুরু করে দিলে-ঠিক যেন হঠাৎ পাগলের মতন!

প্রাচীন লোকটি অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধভাবে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। তিনকড়ি তাতে আরও রেগে গিয়ে সেই মোটা লাঠিগাছা দিয়ে তাঁকে ক্রমাগত নির্দয়ভাবে মারতে লাগল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাটির ওপরে পড়ে গেলেন, তিনকড়ি তখনও ঠিক বাঁদরের মতন মুখ খিঁচিয়ে তার দেহের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘন ঘন লাঠি ও লাথি মেরে একেবারে কাবু করে ফেললে।

এর পরে কমলা আর কিছুই দেখেনি, কারণ এই ভয়ানক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থলে যখন পুলিশ এসে পড়ল, তিনকড়ি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মৃতদেহ পথের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে এবং ঠিক তার দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে একগাছা মোটা লাঠির আধখানা। সেই রক্তমাখা আধখানা লাঠি দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে, সেই লাঠি দিয়েই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে! লাঠির বাকি অংশ অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না, খুব-সম্ভব হত্যাকারী সেটাকে হাতে করেই নিয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তির পকেটের ভিতর থেকে একটি মানিব্যাগ, একটি সোনার ঘড়ি ও একখানি ঠিকানা লেখা খামেমোড়া চিঠি পাওয়া গেল। খামের উপরে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, এই নাম লেখা রয়েছে।

ইন্সপেক্টার সেই খামখানা নিয়ে পরদিন সকালেই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করলে। সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। আগে মৃতদেহ না দেখে আমি আর কোনও কথাই বলব না। একটু দাঁড়ান, আমি জামাকাপড় ছেড়ে আসি।

ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ দেখে তিনি বললেন, আশ্চর্য! ইনি যে কুমার মনোমোহন চৌধুরী!

ইন্সপেক্টার চমকে উঠে বললে, এও কি সম্ভব হতে পারে, বলেন কী! আপনার ভুল হয়নি তো?

ভুল হওয়া অসম্ভব।

তাহলে হয়তো আপনি খুনিকেও চিনতে পারবেন। তার নাম তিনকড়ি বটব্যাল।

নাম শুনেই অবিনাশবাবু থ হয়ে গেলেন, তার মুখে রা ফুটল না!..খানিক পরে থেমে থেমে প্রায় রুদ্ধস্বরে বললেন, আচ্ছা, এই তিনকড়ি মাথায় কি খুব বেঁটে?

হ্যাঁ, তার দেহ তো বেঁটে বটেই, শুনেছি তার চেহারাও নাকি শয়তানের মতোই সুন্দর। দেখুন দেখি, এই ভাঙা লাঠিগাছা আপনি চিনতে পারেন কি না?

অবিনাশবাবু দেখেই চিনতে পারলেন। কিন্তু এর মালিক তিনকড়ি নয়, তাঁর বন্ধু ডাক্তার জয়ন্ত এবং এ লাঠি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন তিনিই নিজে! এ সব কথা প্রকাশ না করে ইন্সপেক্টারকে ডেকে তিনি বললেন, আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে তিনকড়ির ঠিকানায় নিয়ে যাচ্ছি। তিনকড়ি তাঁকে যে কার্ডখানা দিয়েছিলেন সেখানা এখনও তাঁর পকেটবুকের মধ্যেই আছে।

অবিনাশবাবুর গাড়ি চিৎপুর রোডের অন্যান্য অসংখ্য গাড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে পাথুরেঘাটার সরু রাস্তার ভিতরে ঢুকল। তারপর দু-ধারে কাঁসারিদের বাসনের দোকানগুলো পিছনে রেখে গাড়ি গিয়ে ঢুকল ব্রজদুলাল স্ট্রিটের এক ময়লা গলির ভিতরে! শীতকালের কুয়াশায় সকালের আলো তখনও আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং সেই কুয়াশায় ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরা করছে জনকয়েক দুশমন চেহারার গুন্ডার মতন লোক! ঝিয়ের মতন দেখতে নোংরা কাপড় পরা কতকগুলো স্ত্রীলোক ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই শীতেও উলঙ্গ দেহে কতকগুলো ছেলে চাঁচাচ্ছে, কাঁদছে বা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

ইন্সপেক্টার বললে, তিনকড়ি যেরকম লোক, সে থাকেও দেখছি ঠিক সেই রকম জায়গাতেই।

এ-গলির চেয়েও ছোট, নোংরা ও অন্ধকার আর একটা গলি বা শুড়িপথের ভিতরে ঢুকে পাওয়া গেল তিনকড়ির বাসা। চুন-বালি খসা একখানা নড়বড়ে পুরোনো বাড়ির ভাঙা রোয়াকের ওপরে একটা থুত্থুড়ি বুড়ি বসে-বসে খকখক করে কাশছিল। অবিনাশবাবু তাকে শুধোলেন, হ্যাঁ বাছা, তিনকড়িবাবু কি বাড়ির ভেতরে আছেন?

বুড়ি বিড়বিড় করে বললে, না গো, না! সে মিনসে কাল রাতে একবার এসেছিল, এসেই খানিক পরে আবার কোনও চুলোয় বেরিয়ে গেছে!

সে আবার কখন আসবে বলতে পারো?

বুড়ি এক মিনিট ধরে আগে খক খক করে কাশলে, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, জানিনে বাপু! সে কখন আসে কখন যায়, কাকপক্ষীও টের পায় না!

আমরা একবার তার ঘরে যাব।

তা হয় না গো, তা হয় না! তার ঘরে তালা বন্ধ।

আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তিনি পুলিশের লোক। আমরা তালা ভেঙেই তিনকড়ির ঘরে ঢুকব।

বুড়ির ভাঁজ পড়া মুখে একটা উৎকট আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। ব্যগ্রভাবে সে বললে, তাই নাকি বাবা, তাই নাকি! সে কী করেছে বাবা?

ইন্সপেক্টারের দিকে ফিরে অবিনাশবাবু চুপি-চুপি বললেন, দেখছেন, তিনকড়িকে এখানেও কেউ পছন্দ করে না। তার বিপদের কথা শুনে বুড়ির আহ্লাদের আর সীমা নেই!- তারপর বুড়ির দিকে ফিরে বললেন, এইবারে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলো তো বাছা!

তিনকড়ির ঘরের ভিতরটার সঙ্গে এ-বাড়িখানা যেন খাপ খায় না। তার ঘরে দামি দামি। সোফা, কৌচ, চেয়ার, কার্পেট ও ছবি প্রভৃতি সাজানো রয়েছে। ঘরের অনেক জিনিসই লন্ডভন্ড হয়ে আছে-যেন তাড়াতাড়ি কেউ এ-ঘরের জিনিসপত্তর উলটে-পালটে রেখে চলে গিয়েছে। ঘরের মেঝের এক জায়গায় একখানা আধ-পোড়া চেক-বুক পাওয়া গেল। এবং যে লাঠি দিয়ে খুন। হয়েছিল তারও বাকি আধখানা একটা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে পড়ল। এই পেয়েই ইন্সপেক্টার মহা খুশি! ঘরের ভিতরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল না।

সেই দিন দুপুরেই ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে তিনকড়ির নামে পঞ্চাশহাজার টাকা জমা আছে।

ইন্সপেক্টার বললে, অবিনাশবাবু! খুন করবার পর তিনকড়ির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে, সেই ভাঙা লাঠিটা ঘরের ভেতরে কখনওই ফেলে রেখে যেত না, আর ব্যাঙ্কের চেক-বুকখানাও পুড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করত না। আসলে টাকাই হচ্ছে মানুষের জীবন! পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখন সে আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করতে পারবে, তার পেটও অচল হয়ে পড়বে! সে এখন আমার হাতের মুঠোর ভেতরে এসেছে-তার নামে হুলিয়া বের করলেই সে ধরা পড়বেই পড়বে।

তিনকড়ির নামে হুলিয়া বেরুল। কিন্তু তার চেহারা মার্কামারা হলেও কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না! তিনকড়িকে চেনে এমন আর কোনও লোকেরও সন্ধান মিলল না-কলকাতা শহরের বুক থেকে সে যেন কোনও যাদুমন্ত্রের গুণেই আচম্বিতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

.

পঞ্চম। জাল চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদে নতুন রাস্তায় যে অদ্ভুত দেখতে বাড়িখানার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগার যে-বাড়িখানার ভিতরে আছে, জয়ন্তবাবুর বসতবাড়ি থেকে যে সে বাড়িতে আনাগোনা করা যায়, এ গুপ্তকথাটা বাইরের কেউ জানত না। কারণ তাঁর বসতবাড়ি এক রাস্তায়, আর পরীক্ষাগার, আর এক রাস্তায়, কিন্তু এই দুখানা বাড়ির পিছনদিকই পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন।

হত্যার পরদিনই অবিনাশবাবু জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। খানিক পরে রামচরণ এসে তাঁকে নিয়ে গেল। তারপরে রামচরণ তাকে যখন খিড়কির দরজা দিয়ে পরীক্ষাগারের ভিতরে নিয়ে গেল, অবিনাশবাবু তখন রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এ গুপ্তকথাটা তিনিও জানতেন না।

জয়ন্ত তার পরীক্ষাগারের ভিতরে এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন–তাঁকে দেখলেই মনে হয় তিনি যেন অত্যন্ত পীড়িত। ক্লান্ত, মৃদু স্বরে তিনি বললেন, এসো অবিনাশ, বোসো।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে জয়ন্তের সামনে বসে পড়ে অবিনাশবাবু বললেন, জয়ন্ত, তুমি সব খবর শুনেছ তো?

জয়ন্ত শিউরে উঠে বললেন, শুনেছি। খবরের কাগজের হকাররা ওই খুনের খবরটা চেঁচিয়ে বলতে বলতে এই পথ দিয়েই চলে গেল।

অবিনাশবাবু বললেন, যিনি খুন হয়েছেন, তোমার মতন তিনিও আমার মক্কেল। তার সম্বন্ধেও আমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। আশা করি তিনকড়িকে তুমি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে না।

জয়ন্ত উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, অবিনাশ, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি, আর কখনও আমি তিনকড়ির মুখদর্শন করব না! তার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক চুকে গেছে! আর, তাকে আমি সাহায্য করব কী, সে আমার সাহায্য চায়ও না। তুমি তাকে জানো না, কিন্তু আমি জানি। নিরাপদে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছে! আর কখনও তার দেখা পাবে না!

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে সব শুনলেন। এত অল্প কারণে জয়ন্তের এত উত্তেজিত ভাব তার যেন কেমন-কেমন লাগল। একটু পরে বললেন, তুমি দেখছি তিনকড়ির সম্বন্ধে খুবই নিশ্চিন্ত! অবিশ্যি, সে আর না দেখা দিলে তোমারই মঙ্গল। কিন্তু যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তার সঙ্গে তমারও নাম রটবে, এটা বুঝেছ তো?

জয়ন্ত বললেন, হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে আমি সত্যিই নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই। আমি-আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিখানা পুলিশকে দেখাব কি না তাই ভাবছি। অবিনাশ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি-তুমিই বলো, এখন আমার কী করা উচিত?

অবিনাশবাবু বললেন, এ চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে তিনকড়ির কি ধরা পড়বার সম্ভাবনা?

জয়ন্ত বললেন, না। তিনকড়ির অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সেজন্যে আমার কোনও ভাবনা নেই। আমি কেবল নিজের সুনামের কথা ভাবছি।

অবিনাশবাবু বললেন, আচ্ছা, চিঠিখানা দেখি।

জয়ন্তের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে অবিনাশবাবু গোটা-গোটা হরফে অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখায় পড়লেন?

প্রিয় জয়ন্তবাবু,
আমি হচ্ছি আপনার অযোগ্য বন্ধু। তবু আমার সঙ্গে আপনি যে সদয় ব্যবহার করেছেন তার তুলনা নেই। তবে এইটুকু আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, ভবিষ্যতে আমার জন্যে আপনি কোনও বিপদেই পড়বেন না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমার পালাবার উপায় আমি করে নিয়েছি। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভবদীয়
শ্রীতিনকড়ি বটব্যাল

চিঠিখানা পড়ে অবিনাশবাবু শুধোলেন, চিঠির খামখানা কোথায়?

জয়ন্ত বললেন, সেখানা ভুলে ফেলে দিয়েছি। তার ওপরে ডাকঘরের ছাপ ছিল না। চিঠিখানা লোক মারফত আমার কাছে এসেছে।

তাহলে চিঠিখানা এখন আমার কাছে থাক?

তোমার যা-খুশি করতে পারো। নিজের ওপরে আর আমার বিশ্বাস নেই।

জয়ন্ত, আর একটা কথা জানতে চাই। তুমি কি তিনকড়ির কথা শুনেই তোমার উইল করেছিলে?

জয়ন্ত হঠাৎ অত্যন্ত নিস্তেজভাবে চেয়ারের ওপরে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লেন। তারপরে কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, একথা আমি আগেই জানতুম! হয়তো সে তোমাকে খুন করত। তুমি খুব বেঁচে গিয়েছ।

জয়ন্ত বললেন, অবিনাশ, ভগবান আমাকে খুব শিক্ষাই দিলেন! ওঃ, এ শিক্ষা জীবনে ভুলব না! বলেই তিনি দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন।

অবিনাশবাবু ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসেই রামচরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি তাকে শুধোলেন, রামচরণ, কোনও লোক আজ তোমার বাবুকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে?

রামচরণ বললে, না।

অবিনাশবাবুর মন আবার সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। তবে? তবে কি জয়ন্ত আসল কথা তার কাছে লুকোলে? তবে কি ও-রাস্তার বাড়ি দিয়ে তিনকড়ি নিজেই লুকিয়ে এসে

চিঠিখানা জয়ন্তকে দিয়ে গেছে? কিংবা জয়ন্তের সামনে বসেই এই চিঠিখানা লিখেছে? তাহলে তো ব্যাপার বড় সুবিধের নয়!

অবিনাশবাবু ফিরে এসে নিজের আপিসঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। শরীর বড় শ্রান্ত হয়েছিল, একখানা আসনে গিয়ে বসে আজকের কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর দুই চোখ মুদে এল। তার একজন মক্কেল তিনকড়ির হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর আর একজন মক্কেলের মাথার ওপরেও বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। তিনকড়ি এখন গা-ঢাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু যে-কোনও অসর্তক মুহূর্তে আবার সে বেরিয়ে আসতে পারে, মূর্তিমান মৃত্যুর মতো। তখন জয়ন্তকে কে রক্ষা করবে?

এমন সময় তাঁর প্রধান কর্মচারী অনন্তবাবু গলা পাওয়া গেল। অবিনাশবাবু চোখ খুলে বললেন, কী অনন্ত?

অনন্ত বললে, আজ্ঞে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে। কখন করবেন?

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ নীরবে অনন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। এই অনন্ত তার অনেক দিনের পুরোনো ও বিশ্বাসী লোক। তার এখানে কাজ করবার আগে সে অন্যত্র হাতের লেখা পরীক্ষার কাজ করত। হাতের লেখা পরীক্ষা করতে সে ছিল অদ্বিতীয়। তার এই বিশেষ গুণটি অনেক সময়েই অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর অনেক কাজে লেগেছে।

অনন্ত আবার বললে, আপিসের অনেক কাজ বাকি আছে–

অবিনাশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, থাক গে বাকি, তুমি এক কাজ করো তো অনন্ত। আমি আজ একটা অদ্ভুত ধাঁচের হাতের লেখা পেয়েছি। তুমি একবার দেখবে?–এই বলে তিনি তিনকড়ির লেখা সেই চিঠিখানা বার করে তার হাতে দিলেন।

অনন্ত চিঠিখানার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, একি সেই তিনকড়ি, যে জয়ন্তবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী? এই কি কালকে খুন করে পালিয়েছে?

অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ অনন্ত, এ সেই তিনকড়ি। শুনেছি, হাতের লেখা দেখে লোকের চরিত্র বোঝা যায়। দ্যাখো দেখি, এই চিঠিখানা পড়ে তিনকড়ির চরিত্র তুমি কিছু বুঝতে পারো কি না?

অনন্ত টেবিলের ওপরে চিঠিখানা রেখে বললে, এ হাতের লেখাটা অদ্ভুত বটে! তারপরে চিঠির ওপরে ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হাতের লেখা পরীক্ষা করতে লাগল। খানিক পরে সে বললে, আচ্ছা, আপনার কাছে জয়ন্তবাবুর কোনও চিঠি আছে? আমি একবার দেখব।

আছে বইকী। এই টেবিলের টানাতেই আছে-এই বলে অবিনাশবাবু টেবিলের টানা থেকে একখানা চিঠি বার করে এগিয়ে দিলেন।

অনন্ত সে-চিঠিখানা টেবিলের ওপর তিনকড়ির চিঠির পাশে রাখলে। তারপর মিনিট পাঁচেক পরীক্ষা করে যেন নিজের মনেই মৃদু স্বরে বললে, আশ্চর্য ব্যাপার!

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার, অনন্ত? আর, তুমি ও চিঠি দুখানা একসঙ্গে মিলিয়ে কী দেখছ?

অনন্ত বললে, মশাই, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই চিঠি দুখানা দুরকম করে লেখা বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ দুখানা চিঠিই এক হাতের লেখা!

ভারী আশ্চর্য তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই! কোথায় জয়ন্তবাবু আর কোথায় তিনকড়ি! মানব আর দানব

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, অনন্ত! মনে রেখো, চিঠিখানা গোপনীয়!

যে আজ্ঞে। বুঝেছি।-বলে অনন্ত গম্ভীর মুখে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনকড়ির চিঠিখানা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পুরে ফেললেন। তারপর বিবর্ণ মুখে সভয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন, কী! একটা নরপিশাচের জন্যে জয়ন্ত এই চিঠি জাল করেছে!-তার দেহের রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে গেল!

.

ষষ্ঠ । করুণার শেষ পত্র

দিনে দিনে অনেকদিন কেটে গেল! কুমার মনোমোহন চৌধুরীর হত্যার কোনও কিনারাই হল না। পুলিশ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল, কিন্তু তিনকড়ির টিকিটি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেলে না। পৃথিবী যেন তাকে একেবারেই গ্রাস করে ফেললে।

পুলিশ একে-একে তার জীবনের অনেক ঘটনাই আবিষ্কার করেছে। সে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করত তাদের মধ্যে একজনও ভদ্রলোক ছিল না এবং অনেকেই ছিল জেলফেরত দাগি আসামি। তাদের সঙ্গে মিলে সে যেসব জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ করত, তা শুনলেও মন ঘৃণায় ও ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

জয়ন্তের জন্যে অবিনাশবাবুর দুর্ভাবনা এখন অনেকটা কমে এসেছে; কারণ তিনকড়ির ঘৃণিত মূর্তি আর তার বন্ধুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে না। তিনি মনে করলেন, অমঙ্গ ল থেকেই মঙ্গলের জন্ম হয় কুমার মনোমোহন চৌধুরীর জীবন নষ্ট হল বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে ডাক্তার জয়ন্তের জীবন ভীষণ এক রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ করলে!

ডাক্তার জয়ন্ত আবার তাঁর আগেকার স্বভাব ফিরে পেলেন। বরাবরই তিনি দানশীল ছিলেন, গরিবের দুঃখ-কষ্ট দেখলেই মুক্ত-হস্তে দান করতেন- তার ওপরে এখন তার ধর্মানুরাগও হঠাৎ যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বৈঠকখানায় আবার নিয়মিতভাবে বন্ধুর আসর বসতে লাগল এবং সে আসরে জয়ন্ত এখন ধর্মের কথা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করতে ভালোবাসেন। এইভাবে দুটি দীর্ঘ মাস কেটে গেল বেশ নিরাপদে।

তারপর অবিনাশবাবুর মনে আবার একটা খটকা লাগল। একদিন সন্ধেবেলায় তিনি নিয়মমতো জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই রামচরণ এসে খবর দিলে, বাবুর শরীর ভালো নয়, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না! পরদিন ও তারপর আরও তিন দিন জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে অবিনাশবাবু এইভাবে ধুলোপায়েই ফিরে এলেন। তখন তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে ব্যাপার কী জানবার জন্যে ডাক্তার করুণার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

করুণার বাড়ি থেকে যদিও তাঁকে ধুলোপায়েই ফিরে আসতে হল না, কিন্তু ভিতরে গিয়ে বন্ধুর চেহারা দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বিছানার ওপরে স্থির হয়ে করুণা শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর অমন যে ধবধবে গায়ের রং, আজ যেন কালিমাখা হয়ে গেছে। এই কয়দিনের ভিতরেই তিনি যেন বুড়ো হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর মুখের ওপরে ফুটে উঠেছে। আসন্ন মৃত্যুর অপচ্ছায়া!

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, করুণা, একী! তোমার একী চেহারা হয়েছে!

করুণা আস্তে-আস্তে উঠে বসে বললেন, আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি অবিনাশ, দারুণ আঘাত! এ আঘাত আমি বোধহয় আর সামলাতে পারব না! আমি ডাক্তার, সুতরাং বেশ বুঝতে পারছি আমার জীবনের কোনওই আশা নেই। মরতে আমি চাই না অবিনাশ, কিন্তু মরতে আমাকে হবেই!

অবিনাশবাবু বললেন, ব্যাপার যে কী কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে তোমার অসুখ, ওদিকে জয়ন্তের অবস্থাও–

করুণার মুখের ভাব এক লহমায় বদলে গেল! একখানা কম্পমান হাত তুলে অত্যন্ত বিরক্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে তিনি বললেন, থামো, থামো! ও-নাম আমার কাছে আর কোরো না– আমার মতে জয়ন্তের মৃত্যু হয়েছে! মরা লোকের নাম আমি শুনতে চাই না!

অবিনাশবাবু মনে করলেন, করুণার সঙ্গে জয়ন্তের নিশ্চয়ই খুব ঝগড়া হয়েছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, ছিঃ করুণা, পাগলামি কোরো না! জয়ন্তের সঙ্গে যদি তোমার কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তাহলে দুদিনেই তা দূর হয়ে যাবে! কী হয়েছে সব আমাকে খুলে বলো।

কী হয়েছে, সেকথা তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো।

জয়ন্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়।

এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম না। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব । আমার মৃত্যুর পরে তুমি হয়তো সব কথাই জানতে পারবে, কিন্তু এখন নয়। অবিনাশ, তুমি বোসো। অন্য কথা কও। কিন্তু দোহাই তোমার! জয়ন্তের নাম আমার কাছে কোরো না– আমি কিছুতেই তা সইতে পারব না!

সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে অবিনাশবাবু জয়ন্তকে একখানা চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, করুণার সঙ্গে কী নিয়ে তাঁর মনান্তর হয়েছে, আর কেনই বা তিনি কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে চাইছেন না?

উত্তরে জয়ন্তের কাছ থেকে এই করুণ পত্রখানি এলঃ

ভাই অবিনাশ,

আমাকে তুমি ক্ষমা করো। করুণার সঙ্গে কেন যে আমার মনান্তর হয়েছে, তার কারণ আমি তোমাকেও বলতে পারব না। তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমাদের এই মনোমালিন্য এ জীবনে আর দূর হবার নয়। করুণাকে আমি কোনও কিছুর জন্যেই দায়ী করছি না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা না হওয়াই দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

এখন থেকে আমি সকলকার চোখের আড়ালেই বাস করব। যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাহলে তুমি আমার বন্ধুত্বে যেন সন্দেহ কোরো না। আমাকে তুমি অবাধে নিজের

পথে এগিয়ে যেতে দাও। আমি এখন স্বখাত-সলিলে ডুবে মরছি-যে বিভীষিকা আর যে যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমার নিশিদিন কাটছে, পৃথিবীতে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। আমি যদি পাপী হই তবে পাপের শাস্তিও ভোগ করছি আমিই। এর পরে তুমি আমার এই উপকারটি কেবল করতে পারো। আমার মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা কোরো না।

চিঠিখানা হাতে করে অবিনাশবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন? এ আবার কী হল! আপদ তিনকড়ি তো কোন চুলোয় দূর হয়েছে, জয়ন্ত আবার আগেকার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মুখ আবার হাসিখুশি ও শান্তিতে ভরে উঠেছিল, কিন্তু আচম্বিতে আবার এই অভাবিত পরিবর্তন কীসের জন্যে? জয়ন্ত উন্মাদ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি তো? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? করুণার কথা শুনে বেশ বোঝা যায়, এর ভিতরে অন্য কোনও রহস্যময় কারণ আছে!

এক সপ্তাহ পরে অবিনাশবাবু স্তম্ভিতভাবে শ্রবণ করলেন, করুণার মৃত্যু হয়েছে।

পরদিন সকালে করুণার বাড়ি থেকে তার নামে একখানা সিলকরা চিঠি এল। তার ওপরে করুণার হাতে লেখা রয়েছে, এই পত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন ছাড়া আর কেউ খুলতে পারবেন না। কিন্তু এই পত্র তাঁর হাতে যাবার আগে যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অবিনাশবাবু সিলমোহর ভেঙে মোড়কটা খুলে ফেললেন। তার ভিতরেও সিলমোহর করা আর একখানা পত্র এবং তার ওপরে লেখা-ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায় যেদিন পরলোকগত অথবা অদৃশ্য হবেন, তার আগে এই পত্র কেউ পাঠ করতে পারবেন না।

অবিনাশবাবু বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। জয়ন্তের অদ্ভুত উইলেও তাঁর অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনার কথা আছে। করুণাও আবার সেই অদৃশ্য হওয়ার কথাই লিখেছে! এর কী সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? জয়ন্ত কেন অদৃশ্য হবে? আর এই রহস্যময় লুকোচুরিরই বা কী হেতু আছে?

অবিনাশবাবুর মনে একটা প্রবল প্রলোভন জেগে উঠল, সিল ভেঙে করুণার পত্রখানা আদ্যপ্রান্ত পড়ে দেখবার জন্যে। কিন্তু তিনি অ্যাটর্নি মানুষ, শিক্ষার গুণে এই দুর্দান্ত প্রলোভনকেও সংবরণ করলেন।

.

সপ্তম। জানলার ধারে

সে এক রবিবার। বৈকালের কিছু পরে সদানন্দবাবুর সঙ্গে অবিনাশবাবু তাঁদের নিয়মিত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বেড়াতে-বেড়াতে তাঁরা আবার সেই অদ্ভুত বাড়িখানার সামনে এসে পড়লেন।

সদানন্দবাবু বললেন, আমার গল্প ফুরিয়ে গেল! আর তিনকড়ির দেখা পাওয়া যাবে না।

অবিনাশবাবু বললেন, বোধহয় নয়।

আচ্ছা অবিনাশ, এই বাড়ির ভিতর দিয়ে জয়ন্ত ডাক্তারের বাড়ির ভিতরে যাওয়া যায়, প্রথম দিনে তুমি তো একথা আমাকে বলোনি!

তা বলিনি। কিন্তু সেকথা এখন থাক। বাড়ির সদর দরজাটা খোলা রয়েছে দেখছি। এসো, একবার ভিতরে ঢুকে জয়ন্তের খবর নেওয়া যাক।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সদানন্দবাবু বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। উঠোনের কাছে গিয়ে উপরপানে তাকিয়েই তারা দেখতে পেলেন, দোতলার একটা জানলার ধারে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

অবিনাশবাবু এত সহজে বন্ধুর দুর্লভ দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এই যে জয়ন্ত! কেমন আছো হে?

অত্যন্ত উদাসীনভাবে শুষ্ক স্বরে জয়ন্ত বললেন, মোটেই ভালো নয়। আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

অবিনাশবাবু বললেন, দিনরাত ঘরে বন্দি হয়ে থেকেই তোমার শরীর এমন কাহিল হয়ে পড়েছে! এসো-এসো জামাকাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো! চলো, আমাদের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসবে চলো!

জয়ন্ত কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করে বললেন, হ্যাঁ, আমারও তোমাদের সঙ্গে বাইরে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে! কিন্তু না, না, তা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব!

অবিনাশবাবু বললেন, বেশ তো, তাহলে এইখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যাক না কেন!

জয়ন্ত মৃদু হাসি হেসে বললেন, সেকথা মন্দ নয় কিন্তু বলতে বলতেই আচম্বিতে তার মুখের ওপর থেকে হাসির আলো যেন দপ করে নিবে গেল এবং তার বদলে সেখানে ফুটে উঠল এমন ভয়ংকর নিরাশা ও বিভীষিকার ভাব যে, অবিনাশবাবু ও সদানন্দবাবু-দুজনেরই বুক যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং উপরকার জানলাটাও সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল! কিন্তু তারা যেটুকু দেখেছিলেন সেইটুকুই যথেষ্ট, তারা সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারলেন না, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এসো বাড়িখানাকে পিছনে ফেলে তাড়াতাড়ি অনেকটা এগিয়ে গেলেন!

তারপর অবিনাশবাবু আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

সদানন্দবাবু গম্ভীর মুখে কেবল মাথা নেড়েই সায় দিলেন।

.

অষ্টম । শেষ-রাত্রি

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অবিনাশবাবু একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন।

এমন সময় অতিশয় বিবর্ণ মুখে জয়ন্তের পুরোনো চাকর রামচরণ এসে হাজির!

তার মুখের দিকে তাকিয়েই অবিনাশবাবু সচমকে বললেন, কী রামচরণ, তোমার বাবুর কি অসুখ করেছে?

রামচরণ উদ্বিগ্নভাবে বললে, কী হয়েছে জানি না, কিন্তু একটা কিছু হয়েছেই।

অবিনাশবাবু বললেন, অমন করে বললে চলবে না। আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

রামচরণ বললে, বাবু আজকাল কীরকম মানুষ হয়েছেন আপনি তো সব জানেন। প্রায়ই তিনি ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন। অন্য অন্য বারে বাবু মাঝে-মাঝে এক-আধ বার বাইরে বেরুতেন, কিন্তু আজ এক হপ্তার ভেতরে ঘরের দরজা তিনি একবারও খোলেননি! তাই আমার বড় ভয় হচ্ছে।

অবিনাশবাবু বললেন, ভয়! কীসের ভয়?

আমার মনে হয়, বাবুর কোনও অনিষ্ট হয়েছে!

আঃ, কী যে বলো তার ঠিক নেই! অনিষ্ট আবার কী হবে?

আমার বলতে ভরসা হচ্ছে না, বাবু! তার চেয়ে আপনি নিজেই গিয়ে বরং সব দেখে আসবেন চলুন!

অবিনাশবাবু আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই উঠে জামাকাপড় পরে রামচরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

শীতের কনকনে রাত। চাঁদের মুখ মড়ার মতন হলদে। হাওয়া যেন বরফ-জলে স্নান করে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অবিনাশবাবু পথের পর পথ।

পার হয়ে গেলেন, কিন্তু কোনও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। আজকের এই কুয়াশামাখা শীতার্ত রাত্রি পৃথিবী থেকে যেন সমস্ত জীবনের চিহ্ন মুছে দিয়েছে। এই সমাধির স্তব্ধতা অবিনাশবাবুর ভালো লাগল না। শীত সওয়া যায়, এ মরণের নীরবতা অসহনীয়। এই স্তব্ধতা তার মনের ভিতরে যেন একটা অমঙ্গলের পূর্বাভাস এনে দিলে।

জয়ন্তর বাড়ির কাছে এসে রামচরণ বললে, মা কালী যেন মুখ তুলে চান, বাবু যেন ভালো থাকেন–এই বলে সে দরজায় করাঘাত করলে।

দরজাটা ভিতর থেকে খুলে একজন দারোয়ান দরজায় ফাঁক দিয়ে অত্যন্ত ভীত একখানা মুখ বার করলে।

রামচরণ বললে, ভয় নেই মঙ্গল সিং, আমরা এসেছি।

অবিনাশবাবু ভিতরে প্রবেশ করেই দেখলেন, বাড়ির অন্যান্য দাস-দাসী ও দারোয়ানরা সকলে মিলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে,–প্রত্যেকেরই মুখে ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন।

রামচরণ বললে, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল কোরো না। অবিনাশবাবুকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াও।...বাবু, আপনি পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে আসুন।

রামচরণের সঙ্গে-সঙ্গে অবিনাশবাবু যে বাড়িতে জয়ন্তের পরীক্ষাগার আছে সেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোতলায় উঠে দুজনে পরীক্ষাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

পরীক্ষাগারের দরজার সম্মুখে গিয়ে রামচরণ চেঁচিয়ে বললে, বাবু! অবিনাশবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তাকে বলো গে যাও আমি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না!

রামচরণ অবিনাশবাবুকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এল। তারপর আবার বললে, এখন বলুন তো বাবু, ঘরের ভিতর থেকে যে গলার আওয়াজটা শুনলেন, সেটা কি আমাদের বাবুর গলার আওয়াজ?

অবিনাশবাবু বললেন, জয়ন্তের গলার আওয়াজ অন্যরকম শোনাল বটে।

রামচরণ বললে, অন্যরকম? হ্যাঁ, অন্যরকম শোনাবেই তো! আজ বিশ বছর এখানে চাকরি করছি, বাবুর গলার আওয়াজ আমি চিনি না? ও কখনওই আমার বাবুর গলার আওয়াজ নয়!

অবিনাশবাবু বললেন, এ ভারি আশ্চর্য কথা! ধরো তোমার কথাই যদি সত্য হয়, জয়ন্তকে যদি কেউ খুনই করে থাকে, তাহলে খুনি পালিয়ে না গিয়ে এই ঘরের ভিতরেই বসে থাকবে কেন? রামচরণ, তোমার সন্দেহের কোনও মানেই হয় না!

রামচরণ বললে, বাবু, দেখছি আপনি সহজে আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না! বেশ, তাহলে আরও শুনুন, বাবু-কিংবা বাবুর নামে যে হতভাগা লোকটা ওই ঘরের ভেতরে আছে, সে আজ সাত দিন ধরে খালি ওষুধ ওষুধ বলে চিৎকার করছে। জানলা গলিয়ে ওষুধের নাম লিখে রোজই সে কাগজের পর কাগজ ফেলে দেয়, আর তাই নিয়ে সারা শহরের সমস্ত ওষুধের দোকানে ছুটোছুটি করে আমাকে মরতে হয়। কিন্তু কোনও ওষুধই ও লোকটার পছন্দ হয় না।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ও রকম কোনও কাগজ তোমার কাছে আছে?

রামচরণ নিজের ফতুয়ার পকেটের ভিতর থেকে একখানা কাগজ বার করে দিলে। কাগজখানা নিয়ে অবিনাশবাবু খুব মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। জয়ন্ত কোনও ঔষধালয়ের মালিককে লিখেছেন : আপনি যে ঔষুধটি পাঠিয়েছেন তা একেবারেই অকেজো। দু-বছর আগে আমার ফরমাসে আপনি এই ঔষধটাই অনেক বেশি পরিমাণে আনিয়ে রেখেছিলেন। সেবারে যেখান থেকে ঔষধ আনানো হয়েছিল আবার সেইখানেই ভালো

করে খোঁজ নিন। একেবারে খাঁটি ঔষধ না হলে আমার চলবে না। এ ঔষধ যে আমার কতটা দরকারি, সে কথা বোধহয় আপনি ভালো করে বুঝতে পারেননি। এই ঔষধই আমি চাই, যেখান থেকে পারেন আনিয়ে দিন, এজন্যে যত টাকা খরচ করতে হয় তা করতে আমি রাজি আছি।

অবিনাশবাবু বললেন, এই হাতের লেখা যে জয়ন্তের তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই।

রামচরণ বললে, হা, হাতের লেখাটা তারই মতন দেখতে বটে। কিন্তু হাতের লেখাটা নিয়ে কী হবে, আমি যে লোকটাকে স্বচক্ষে দেখেছি!

অবিনাশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, স্বচক্ষে দেখেছ?

রামচরণ বললে, হ্যাঁ। একদিন ঘরের দরজা দৈবগতিকে ভোলা ছিল। হঠাৎ আমি এইখানে এসে পড়ি। আমাদের বাবু আমার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো ওষুধের আর আরকের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তিনি আমার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! আমি চকিতের জন্যে তাকে দেখেছিলুম- কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই যা দেখলুম তাতে আমার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত ভয়ে খাড়া হয়ে উঠল। বাবু, তিনিই যদি আমাদের মনিব হবেন তাহলে মুখে তিনি মুখোশ পরেছিলেন কেন? তিনিই যদি আমাদের মনিব হবেন তাহলে আমার সুমুখ থেকে অমন ইঁদুরের মতন পালিয়ে যাবেন কেন? আমি কি তার পুরোনো চাকর নই? তারপর- বলতে বলতে থেমে পড়ে রামচরণ দুই হাতে তার মুখ ঢেকে ফেললে।

অবিনাশবাবু বললেন, ব্যাপারটা এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বাবুর মুখে বোধহয় হঠাৎ কোনও রোগের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সেইজন্যেই তিনি মুখোশ পরে আছেন, কারুর সঙ্গে দেখা করছেন না, আর ওষুধ আনবার জন্যে বারবার লোক পাঠাচ্ছেন। এছাড়া আর কিছু কারণ থাকতে পারে না। রামচরণ, মিছেই আমরা ভয় পেয়েছি।

রামচরণ মাথা নেড়ে বললে, না বাবু, তিনি কখনও আমাদের মনিব নন! আমাদের বাবু লম্বা-চওড়া আর এ লোকটা বেঁটে,-দেখতে ঠিক বামনের মতো। আপনি কি বলতে চান বিশ বছর এখানে থেকেও আমার বাবুকে দেখতে আমি ভুল করব?

অবিনাশবাবু বললেন, তুমি যখন এত জোর করে বলছ, তখন তোমার কথা আমাকে মানতেই হবে! বেশ, আমি না হয় পরীক্ষাগারের দরজা ভেঙে ফেলবারই ব্যবস্থা করছি!

রামচরণ উৎসাহিত স্বরে বললে, তাই করুন বাবু, তাই করুন! আমি এখনি আপনাকে কুড়ুল এনে দিচ্ছি!

রামচরণ তাড়াতাড়ি একখানা কুড়ুল নিয়ে এসে হাজির করলে।

অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ, আর এক কথা, তুমি যাকে দেখেছ তাকে চিনতে পেরেছ কি?

রামচরণ বললে, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তখন বলতে হয়। সে আর কেউ নয়, তিনকড়ি বটব্যাল!

অবিনাশবাবু চমকে উঠে বললেন, কী বললে?

হ্যাঁ, ঘরের ভেতরে আমি তিনকড়ি বটব্যালকেই দেখেছি! তার ভাবভঙ্গি আর চলবার ধরন কীরকম অদ্ভুত তা তো আপনি জানেন? আমাকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে সে যখন অদৃশ্য হল, তখন আমার মনে হল ঠিক যেন একটা বড়জাতের বাঁদর লাফ মেরে পালিয়ে গেল! বাবু, আমি হলফ করে বলতে পারি, সে ওই তিনকড়ি ছাড়া আর কেউ নয়!

অবিনাশবাবু বললেন, এতক্ষণে তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে! রামচরণ, তিনকড়ি হচ্ছে মূর্তিমান শনি! সে যখুনি তোমার বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে মিশেছিল, তখুনি আমি বুঝেছিলুম যে তোমার বাবুর অদৃষ্ট ভালো নয়! হ্যাঁ, তিনকড়ি নিশ্চয়ই আমার বন্ধুকে খুন করেছে। আর হয়তো কোনও গুঢ় কারণে জয়ন্তের ঘরেই লুকিয়ে আছে। এখন আমাদের যা কর্তব্য তাই করি এসো। লোকজনদের ডাকো!

রামচরণের হাঁকাহাঁকিতে দারোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যরা সেখানে এসে হাজির হল।

অবিনাশবাবু বললেন, তোমরা সবাই লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হও। জনকয় লোক আমাদের সঙ্গে থাকো, বাকি সবাই এই বাড়ির খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে পাহারা দিক। কেউ যেন সে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুতে না পারে। এসো রামচরণ, আমরা আবার ওপরে যাই।

অবিনাশবাবু সকলকে নিয়ে দোতলায় উঠে আবার পরীক্ষাগারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সেইখান থেকেই শুনতে পেলেন, ঘরের ভিতরে কে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

রামচরণ বললে, দিনে-রাতে যখুনি এখানে আসি, তখুনি শুনি ওর পায়ের শব্দ! এ শব্দের আর বিরাম নেই! রাতেও ঘুমোয় না, ঘরময় চলে বেড়ায়! আপনি ভালো করে কান পেতে শুনে দেখুন, ও কি আমার বাবুর পায়ের শব্দ?

অবিনাশবাবু শুনে বুঝলেন, রামচরণের কথাই সত্য! জয়ন্তের পায়ের শব্দ অন্যরকমই বটে! তিনি বললেন, এই পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু তোমরা শুনেছ?

রামচরণ বললে, শুনেছি। একদিন সে কাঁদছিল!

কাঁদছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, সে স্ত্রীলোকের মতন কাতরভাবে কাঁদছিল-যেন নরকযন্ত্রণা ভোগ। করছে! সে-কান্না কান পেতে শোনা যায় না!

অবিনাশবাবু গম্ভীর মুখে দরজায় কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, জয়ন্ত! আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই!

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল না।

অবিনাশবাবু আবার বললেন, জয়ন্ত, আমাদের মনে সন্দেহ হয়েছে! হয় তুমি দরজা খোলো, নয় আমরা দরজা ভেঙে ফেলব!

ঘরের ভিতর থেকে আকুলভাবে কে বলে উঠল, অবিনাশ, অবিনাশ! দয়া করো– দরজা ভেঙো না!

অবিনাশবাবু বললেন, এ তো জয়ন্তের গলা নয়–এ যে তিনকড়ির গলার আওয়াজ! রামচরণ, ভাঙো দরজা!

দরজার ওপরে কুড়লের পর কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল।

ঘরের ভিতরে কে দারুণ আতঙ্কে তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল! আরও বারকয়েক কুড়ুলের ঘা খেয়েই দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সকলে সভয়ে উঁকি মেরে

ঘরের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের ওপরে একটা মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে তখনও কেন্নোর মতো কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সকলে ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল, দেখতে-দেখতে তাদের চোখের সামনেই মূর্তিটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অবিনাশবাবু দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিলেন। সে দেহ তিনকড়ি বটব্যালের!

তিনকড়ির গায়ে রয়েছে জয়ন্তের জামা কাপড়। সে জামা-কাপড় তার ছোট ও বেঁটে দেহের পক্ষে একেবারেই মানানসই হয়নি। তার মুখ তখনও কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল বটে, কিন্তু দেহে জীবনের কোনও লক্ষণই ছিল না। তার মুঠোর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা ওষুধের শিশি!

অবিনাশবাবু বললেন, আমরা ঠিক সময়ে এসে পড়তে পারলুম না! একে আর আমরা বাঁচাতেও পারব না, শাস্তি দিতেও পারব না! তিনকড়ি বিষ খেয়েছে। এখন দেখা যাক জয়ন্তের দেহ কোথায় আছে।

তারপর জয়ন্তের দেহের জন্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হল। টেবিলের তলা, আলমারি, দেরাজ ও সমস্ত অলি-গলি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, কিন্তু জয়ন্তের দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

অবিনাশবাবু বললেন, তাহলে জয়ন্ত হয়তো এখান থেকে পালিয়ে গেছে!

রামচরণ কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, না, না- ওই শয়তান আমার বাবুর দেহকে কোথাও পুঁতে রেখেছে।

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি হঠাৎ টেবিলের ওপরে পড়ল। টেবিলের ওপরে একটা বড় কাগজের মোড়ক রয়েছে তার ওপরে লেখা, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন!

অবিনাশবাবু তাড়াতাড়ি মোড়কটা খুলে ফেললেন। প্রথমেই তার নাম লেখা একখানা ছোট খাম ও সেইসঙ্গে একতাড়া কাগজ পাওয়া গেল। কাগজগুলোর ওপরে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে-আমার উইল। সে উইলখানাও ঠিক আগেকার উইলের মতনই অদ্ভুত, আগেকার উইলের সব কথাই তার ভিতরে আছে, কেবল তিনকড়ি বটব্যালের নামের বদলে রয়েছে অবিনাশবাবুরই নিজের নাম! জয়ন্ত তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি অবিনাশবাবুকে দান করেছেন।

অবিনাশবাবুর মাথা ঘুরতে লাগল, আপন চোখকেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না! অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, এও কি সম্ভব? তিনকড়ি আজ সাত দিন এই ঘরে রয়েছে, তবু এ উইল সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়নি?

আপনাকে সামলে নিয়ে অবিনাশবাবু তাঁর নাম লেখা খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিখানা খুলে তার তারিখ দেখেই তিনি সচকিত স্বরে বলে উঠলেন, রামচরণ, রামচরণ! জয়ন্ত

বেঁচে আছে! এ-চিঠির ওপরে আজকেরই তারিখ লেখা রয়েছে! জয়ন্ত যদি আজকেই মারা যেত, তাহলে তিনকড়ি এর মধ্যেই তার দেহকে কখনও সরিয়ে ফেলতে পারত না। কিন্তু জয়ন্ত কেন পালাল? তিনকড়ি কেন আত্মহত্যা করলে? সমস্তই যে ধাঁধার মতন মনে হচ্ছে।

খানিকক্ষণ চিন্তিতমুখে বসে থাকবার পর অবিনাশবাবু চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। চিঠিখানা ছোট। তাতে লেখা রয়েছেঃ

ভাই অবিনাশ,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন তুমি আর আমাকে খুঁজে পাবে না। কী কারণে এবং কেমন করে আমি যে অদৃশ্য হব, সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। তবে আমার পরিণাম যে ঘনিয়ে এসেছে, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। করুণার মুখে শুনেছি, আমার সম্বন্ধে যা সত্য কথা, সেটা সে লিখে তোমার কাছে পাঠিয়েছে; এবং আমি বর্তমান থাকতে সে-ইতিহাস তোমাকে পাঠ করতে নিষেধ করে গেছে। আমার অনুরোধ, তুমি আগে সেই ইতিহাস পাঠ করো। তাতেও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তাহলে এই মোড়কের ভিতরে আমি আমার যে স্বীকার-উক্তি লিখে রেখে গেলুম, তা পড়ে দেখলেই তোমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইতি।

তোমার অসুখী ও অভাগা বন্ধু
জয়ন্ত

অবিনাশবাবু মোড়কের ভিতরে আর একতাড়া কাগজ পেলেন। সেইগুলো হাতে করে নিয়ে তিনি বললেন, রামচরণ, এ কাগজগুলো অত্যন্ত গোপনীয়। এর কথা কারুর কাছে বলবার দরকার নেই। আগে এগুলো আমি পড়ে দেখি, তারপরে পুলিশে খবর দিলেই চলবে।

.

নবম । করুণার কাহিনি

করুণার আত্মকাহিনি বার করে অবিনাশবাবু পড়তে লাগলেনঃ

দিন-চারেক আগে, একদিন সন্ধেবেলায় আমি একখানা রেজিস্টারি করা চিঠি পেলুম। চিঠিখানা এসেছে আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী জয়ন্তের কাছে থেকে। চিঠি পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কারণ, তার আগের রাত্রেই জয়ন্তের বাড়িতে বসে তার সঙ্গে গল্পস্বল্প করে ফিরে এসেছি। হঠাৎ এরই মধ্যে এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, আমাকে রেজিস্টারি করে চিঠি লেখবার দরকার হল? চিঠিখানা পড়ে আমার বিস্ময় আবার আরও বেড়ে উঠল। কারণ চিঠিতে জয়ন্ত এই কথাগুলি লিখেছিলেনঃ

ভাই করুণা,

আমার পুরোনো বন্ধুদের ভিতরে তুমি হচ্ছ প্রধান একজন। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসার অভাব হয়নি কোনওদিন।

তুমি যদি কোনওদিন এসে আমাকে বলতে যে, জয়ন্ত, আমার জীবন আর সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো, তাহলে আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দান করতে পারতুম। করুণা, আমারই জীবন ও সম্মান বিপন্ন হয়েছে, তুমি আমাকে রক্ষা করো! তুমি যদি আমার কথায় কান না পাতো, তাহলে আমার সর্বনাশ হবে। অবশ্য তোমার কাছ থেকে আমি যা প্রার্থনা করছি তা অন্যায় কি না, তুমি নিজেই বিচার করে দ্যাখো।

আজ সন্ধ্যায় যদি তোমার কোনও কাজ থাকে, তার কথা একেবারে ভুলে যাও। আজ তোমাকে ভারতসম্রাট আমন্ত্রণ করলেও বাড়ি থেকে তুমি এক পা বেরিয়ো না। যে চিঠিখানা তুমি এখন পড়ছ, সেইখানা হাতে করে তুমি সিধে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। সেখানে রামচরণ আছে-সে ও আমার হুকুম পেয়েছে। রামচরণ তোমাকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে যাবে। সেই ঘরে গিয়ে তুমি টেবিলের ডান দিকের দেরাজটা খুলে

ফেলবে। দেরাজের নীচের তাকে একটি কালো রঙের বাক্স আছে। সেই বাক্সটি নিয়ে খুব সাবধানে তুমি আবার তোমার নিজের বাড়িতে ফিরে আসবে। এই কথাগুলি তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।

আমার এই চিঠি নিশ্চয়ই তুমি সন্ধ্যার সময় পাবে। তারপর গাড়ি করে আমার বাড়িতে গিয়ে ফিরে আসতে তোমার বেশিক্ষণ লাগবে না। সুতরাং আমি ধরে নিতে পারি দুপুর রাতে তুমি নিজের বাড়ির ভিতরেই থাকবে। এবং আশা করি তখন তোমার বাড়ির চাকরবাকর ও অন্যান্য লোকজন কেউ জেগে থাকবে না।

কিন্তু তুমি জেগে থেকো। আর একলা থেকো। রাত বারোটা বাজলেই আমার এক দূত তোমার কাছে গিয়ে হাজির হবে। এবং তোমার কাছে সে আমার নাম করলেই তুমি সেই কালো বাক্সটা তার হাতে সমর্পণ কোরো। এই কাজগুলি করলেই তোমার কর্তব্য শেষ হবে। সাবধান, এর মধ্যে যেন একটিও গলদ না হয়। কারণ তোমার সামান্য ভুলচুকেই আমার জীবন পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

আমার এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে তুমি বিস্মিত হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বন্ধু, যতই বিস্মিত হও, আমার কথায় অবহেলা কোরো না। আমি এক অজানা অচেনা জায়গায় বিপদ সাগরে ভাসছি, একমাত্র তুমিই আমাকে কূলে এনে তুলতে পারো। করুণা, তোমার বন্ধুকে রক্ষা করো।
ইতি
তোমার বিপন্ন বন্ধু
জয়ন্ত

পত্রখানা পড়ে প্রথমে আমি ভাবলুম, জয়ন্ত একেবারে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরেই মনে হল, এখনও যখন তার পাগলামির চাক্ষুষ পরিচয় পাইনি, তখন জয়ন্তের কথামতো কাজ আমাকে করতে হবেই। তখনই উঠে গাড়ি করে জয়ন্তের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। রামচরণকে দেখে মনে হল সে যেন আমার পথ চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে। তারপর

জয়ন্তের ঘরে গিয়ে টেবিলের দেরাজ খুলে সেই কালো বাক্সটা নিয়ে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম।

বাড়িতে এসে কেমন কৌতূহল হল, কালো বাক্সের ভিতরে কী আছে তা দেখবার জন্যে। বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললুম। প্রথমেই চোখে পড়ল কতকগুলি শিশি। সেসব শিশির কোনওটার ভিতরে রয়েছে রক্তের মতো টকটকে লাল কী তরল পদার্থ আর কোনও কোনওটাতে বা সাদা কি অন্য রঙের গুঁড়ো ওষুধ। একখানা ছোট ডায়েরির মতো বইও দেখলুম, কিন্তু তার পাতাগুলো উলটে কিছুই বুঝতে পারলুম না। খালি কতকগুলো তারিখ আর কতকগুলো অঙ্ক! মাঝে-মাঝে কেবল এই দুটি কথা লেখা আছে–আমার প্রতিরূপ ও একেবারে ব্যর্থতা! এই দুটি কথা আমার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুললে বটে, কিন্তু আসল কোনও জানবার কথা জানতে পারলুম না।

এই ওষুধের বাক্সটা আমার বাড়িতে থাকলেই যে জয়ন্তের জীবন ও সম্মান রক্ষা পাবে, এরকম কথার অর্থ কী? জয়ন্তের দূত আমার বাড়িতে এসে যখন বাক্সটা নিয়ে যেতে পারে, তখন তার নিজের বাড়িতেই সে তাকে পাঠালে না কেন? আর আমার সঙ্গে গভীর রাত্রে, সকলের অগোচরেই বা সে দেখা করতে আসবে কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে। মনে হল যেন মস্ত এক প্রহেলিকা! যা হোক, তবু জয়ন্তের কথামতো আমি বাড়ির সকলকে সেদিন সকাল সকাল ঘুমোতে যেতে বললুম।

ঘড়িতে বাজল রাত বারোটা। সঙ্গে-সঙ্গে শুনলুম সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ! আমি নিজেই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম। দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বামনের মতন বেঁটে লোক।

শুধোলুম, আপনি কি জয়ন্ত ডাক্তারের কাছ থেকে আসছেন?

সে শুধু বললে, হ্যাঁ।

তাকে বাড়ির ভিতরে আসতে বললুম। সে আমার কথায় কান না দিয়ে প্রথমটা একবার পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। একটা পাহারাওয়ালা পায়ে পায়ে এই দিকেই আসছিল। সে তাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তার এমনধারা রকম-সকম আমার ভালো লাগল না। ঘরের ভিতরে এসে উজ্জ্বল আলোতে আমি তাকে স্পষ্টভাবে দেখবার সুযোগ পেলুম। জীবনে তাকে আর কখনও দেখিনি। সে যে বেঁটে এ কথা আগেই বলেছি, তার গড়নও যেন কেমন হাড়গোড় ভাঙা দ-এর মতন। আর তার মুখটা দেখলেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। এ রকম বিশ্রী, ভয়াল চেহারা খুব কমই নজরে পড়ে।

তার চেহারা দেখলে যেমন ঘৃণা হয়, তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেও তেমনি হাসি পায়। তার জামাকাপড় দামি ও বিলাসীর উপযোগী। কিন্তু সে জামাকাপড় তার চেয়েও ঢের বেশি ঢ্যাঙা কোনও লোকের গায়েই মানাত ভালো। এরকম বেঢপ দেহে এমন সুন্দর অথচ বেমানান জামাকাপড় পরে কোনও ভদ্রলোক যে রাস্তায় বেরুতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। নিজের চারিদিকে কেমন-একটা ঘৃণ্য, ভয়াবহ ও রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে সেই কিম্ভূতকিমাকার জীবটা যেন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। এবং এটাও লক্ষ করলুম, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে!

সে ভাঙা-ভাঙা কর্কশ স্বরে আমাকে শুধোলে, বাক্সটা এনেছেন কি? বাক্সটা? বলতে বলতে অত্যন্ত অধীরভাবে হাত বাড়িয়ে আমার কাধ ধরে সে নাড়া দিতে লাগল।

তার হাতের ছোঁয়ায় আমার গায়ের ভিতর দিয়ে যেন খানিকটা বরফের স্রোত বয়ে গেল। আমি তার হাতখানা ধরে তাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললুম, এতটা ব্যস্ত হবেন না মশাই, থামুন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত নেই। ইচ্ছা করেন তো বসতে পারেন।-বলে আমি নিজেই আগে আসন গ্রহণ করলুম।

লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ ভদ্রভাবেই বললে, মাপ করুন করুণাবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে। ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। বুঝতেই পারছেন তো, জয়ন্তবাবু কী জন্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন... তাঁর টেবিলের দেরাজে...একটা কালো বাক্স বলতে-বলতে তার কণ্ঠস্বর যেন বন্ধ হয়ে এল।

তার অবস্থা দেখে আমার মায়া হল। টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমি বললুম, বাক্সটা ওইখানেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন তো?

সে এক লাফ টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পরেই একটা টোক গিলে বুকের ওপরে হাত দিয়ে থেমে পড়ল। তার অবস্থা দেখে আমার ভয় হল, হয় সে এখনই মারা পড়বে, নয়তো পাগল হয়ে যাবে!

আমি বললুম, মশাই, নিজেকে সামলে নিন!

আমার পানে তাকিয়ে সে একটা ভীতিকর হাসি হাসলে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে টপ করে বাক্সটা তুলে নিয়ে তার ডালাটা ফেললে খুলে। বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে বিপুল আনন্দে সে এমন চিৎকার করে উঠল যে, আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তারপর সে সহজভাবেই বললে, আপনার ঘরে একটা মেজার-গ্লাস আছে?

আমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করলুম।

আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে সে গেলাসের ভিতরে খানিকটা রাঙা তরল পদার্থ ঢেলে তাতে আবার কিছু সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে। জলে সোডা ঢাললে যেমন হয়, গেলাসের ভিতরে তরল জিনিসটা তেমনি বুড়বুড়ি কাটতে লাগল। তারপর সেই রাঙা রংটা প্রথমে কমলা ও পরে পাতলা-সবুজে পরিণত হল। লোকটা এতক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে গেলাসের ভিতরে এই পরিবর্তন লক্ষ করছিল। এখন গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে চোখ তুলে মৃদু হাস্য করলে।

তারপর সে বললে, এখন আপনি কী করতে চান? এই গেলাসটা হাতে করে আমাকে কি বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন? না, এর পরে আমি কী করব সেটা দেখবার জন্যে আপনার কৌতূহল হচ্ছে? বেশ করে ভেবে জবাব দিন, কারণ আপনি যা বলবেন আমি ঠিক তাই-ই করব! অবশ্য, আমি এখানে থাকি আর না থাকি, তাতে আপনার লাভও নেই অলাভও নেই। তবে যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে আমি এখুনি আপনার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে পারি!

আমি খুব কঠোর স্বরে কথা কইবার চেষ্টা করে বললুম, মশাই, আপনি হেঁয়ালির ভাষায় কথা কইছেন, ওরকম কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনাদের এই অদ্ভুত লুকোচুরির ভিতরে আমিও জড়িয়ে পড়েছি, এখন শেষ পর্যন্ত না দেখে আর ছাড়ব না।

লোকটা গম্ভীর স্বরে বললে, করুণা, বেশ কথা বলেছ! কিন্তু শোনো। এখনই যা দেখবে, সেটা কেবল তুমিই দেখবে,–সে কথা আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে! তুমি বড় অবিশ্বাসী, না করুণা? তোমার সঙ্কীর্ণ মন আমার বৈজ্ঞানিক মত মানেনি, দ্রব্যগুণের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছ! আজ স্বচক্ষে বিজ্ঞানের শক্তি দ্যাখো!

ওষুধের গেলাসটা সে ঠোঁটের কাছে তুলে এক চুমুকেই শেষ করে ফেললে এবং আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। তারপর সে ঘুরতে-ঘুরতে ও টলতে টলতে পড়ে যেতে যেতে টেবিলের একটা কোণ দুই হাতে চেপে ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিলে এবং আড়ষ্ট চোখে ঘনঘন হাঁপাতে লাগল।

তারপর সে কী বীভৎস স্বপ্নই আমার চোখে জেগে উঠল! আমি যেন স্বচক্ষেই দেখলুম, তার দেহ ক্রমেই ফুলে বড় হয়ে উঠছে এবং তার আগেকার দেহের গড়ন যেন ক্রমেই বদলে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপরে যা দেখলুম, তাতে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না–চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের ওপরে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে ভীষণ আতঙ্কে আমি বারবার চাঁচাতে লাগলুম–ভগবান! ভগবান! ভগবান!

–আমার চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে যেন মৃত্যুর ভিতর থেকে জীবনলাভ করেই, বিবর্ণমুখে অন্ধের মতো শূন্যে দুই হাত বাড়িয়ে যে-মূর্তি একটা অবলম্বন খুঁজছে, সে আর কেউ নয়–আমার বন্ধু জয়ন্ত!

...তারপর জয়ন্ত আমার কাছে বসে তার যে দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা করলে, তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, আমার সমস্ত আত্মা এখনও সঙ্কুচিত হয়ে আছে। আমি যা দেখেছি আর শুনেছি তা বিশ্বাস করব কি না জানি না। কিন্তু আমার জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেছে। রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি না–চোখের সামনে যেন একটা দারুণ আতঙ্ক সর্বদাই মূর্তি ধরে বসে থাকে আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, তবু আমাকে বোধহয় অবিশ্বাসী হয়েই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

অবিনাশ, কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি বলে রাখি। নিশুত রাতে আমার ঘরে সেদিন যে-জীবটার আবির্ভাব ঘটেছিল, নরহত্যাকারী তিনকড়ি নামেই সে তোমাদের সকলের কাছে পরিচিত!

.

দশম। জয়ন্তের আত্মকাহিনি

অবিনাশ, জন্ম আমার বড়লোকের ঘরে। কিন্তু ধনীর ছেলে হলেও আমার লেখাপড়ার কোনও ত্রুটিই হয়নি। লেখাপড়া সাঙ্গ করে যখন আসল জীবন শুরু করলুম, তখন আমার ভবিষ্যৎ ছিল খুবই উজ্জ্বল।

আমার প্রকৃতিটা ছিল অদ্ভুত। একদিকে আমি ছিলুম যেমন আমোদপ্রিয় ও চপলস্বভাব, অন্যদিকে তেমনি গম্ভীর। এই চপলতা ও গাম্ভীর্যকে আমি কখনও এক করে ফেলতুম না। আমোদের বেঁকে আমি এমন সব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, আমার প্রকৃতির গাম্ভীর্য কোনওদিন তাতে সায় দেয়নি। কিন্তু লোকের কাছে আমার এই চপল স্বভাবকে বরাবরই আমি লুকিয়ে এসেছি। লোকে বরাবরই জানে যে আমি হচ্ছি একজন গম্ভীর প্রকৃতির

মানুষ, হালকা আমোদপ্রমোদ মেতে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করতে পারি না। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আমার এই গুপ্ত আমুদে স্বভাবের পরিচয় পাননি। এইখানে সকলের চোখে এতদিন ধুলো দিয়ে এসেছি।

আদিম কাল থেকেই মানুষের এই দুর্বলতা আছে। সে নিজের চরিত্রের সমস্তটা কোনওদিনই সকলের সামনে খুলে দেখায়নি। সুন্দর মুখোশ পরে সে তার চরিত্রের কদর্যতা গোপন করেছে। যে শয়তান, সে সাধুর ছদ্মবেশে দশজনের মাঝখানে আনাগোনা করে। মানুষ এই লুকোচুরি বিদ্যাতে পাকা হয়ে উঠেছে।

আমি যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে জীবনের অনেকদিন কাটিয়েছি, একথা তোমরা সকলেই জানো। আমি এমন সব অদ্ভুত বিষয় নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা করেছি, আর কোনও বৈজ্ঞানিক কখনও যা করেননি। আমার এই সব পরীক্ষা নিয়ে অনেকে অনেকরকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু আমি কোনওদিনই সেসব গায়ে মাখিনি। ওই অবিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের করুণা ছিল প্রধান একজন।

মানুষের প্রকৃতির ওই দুরকম ভাবকে দুটো সম্পূর্ণ স্বাধীন আলাদা অংশে বিভক্ত করা যায় কি না, এই নিয়ে অনেকদিন ধরে চিন্তা ও পরীক্ষা করে আসছি। আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু প্রকৃতির সঙ্গে এই অসাধু প্রকৃতির মিলন পৃথিবীর সুখ-সৌভাগ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সাধুতা ও অসাধুতা যদি নিজের নিজের উপযোগী মূর্তি ধারণ করে আপন-আপন পথে আলাদা হয়ে চলতে পারে, তাহলে তারা অনেক অশান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। সু, যোগ্য-রূপে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারে, কু-র কুকার্যের জন্যে তাকে আর অনুতপ্ত ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। কু নিজের মনের খুশিতে নরকের পথে এগিয়ে যেতে পারে, সু-র কাছ থেকে তাকে ধমক খেতে ও বাধা পেতেও হয় না। মনের ভিতরে সু ও কু-র দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রায় প্রতি কবিই অনেক কথা বলেছেন। সেই দ্বন্দ্ব যাতে বন্ধ হয় এবং সু আর কু আলাদা-আলাদা রূপ পায়, তাই নিয়ে আমি প্রাণপণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলুম।

এই পরীক্ষার ভিতরের কথা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। কারণ প্রথমত, যাঁরা বৈজ্ঞানিক নন তারা আমার কথা বুঝতে পারবেন না; দ্বিতীয়ত, আমার পরীক্ষা যে অসম্পূর্ণ এ কথা আজ নিজেই বুঝতে পারছি; এই অসম্পূর্ণ পরীক্ষার গুপ্তকথা প্রকাশ করে দিলে পৃথিবীতে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হবে-কেন না জগতে দুষ্ট মানুষের কোনওই অভাব নেই।

আজ মনে হচ্ছে, পরীক্ষার এমন আংশিকভাবে সফল না হলেই, সেটা হত আমার পক্ষে মস্ত এক আশীর্বাদ। এই বিপুল পৃথিবী ও সমস্ত জীব যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তিমান স্রষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে আমার আত্মাকে আমি বিপদগ্রস্ত করেছি।

যেদিন আমার বিশ্বাস হল যে পরীক্ষায় আমি সফল হয়েছি, সেদিন আমার মনে খুবই আনন্দ হল বটে, কিন্তু নিজের ওপরে নিজের আবিষ্কৃত এই ঔষধটা প্রয়োগ করতে সাহস হল না সহজে। কারণ একই আত্মার দুই প্রকৃতির ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটো দেহ আত্মপ্রকাশ করবে, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা। এমনি ইতস্তত করতে করতে অনেকদিন কেটে গেল। কিন্তু শেষটা এই অভাবিত আবিষ্কারের প্রলোভন আমি আর সামলাতে পারলুম না। এক অভিশপ্ত রাত্রে সমস্ত ভয়ভাবনায় জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্জয় সাহসে আমি আমার আবিষ্কৃত এই ঔষধটা গলাধঃকরণ করলুম।

তারপর, সে কী ভয়ংকর যন্ত্রণা! আমার দেহের সমস্ত হাড় ও মাংস যেন কে জাঁতাকলে ফেলে পেষণ করতে লাগল-চোখের সুমুখ থেকে পৃথিবীর সমস্ত দীপ্তি ধীরে ধীরে নিবে গেল!...ক্রমে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা আবার কমে এল এবং আমার মনে হল যেন আমি এক সাংঘাতিক ব্যাধির কবল থেকে মুক্তিলাভ করলুম! অনুভব করলুম, আমার ভিতরে যেন এক অবর্ণনীয়, বিস্ময়কর ও অপূর্ব মধুর নূতনত্বের সঞ্চার হয়েছে। আমার দেহ যেন ঢের বেশি হালকা, তরুণ ও সুখী হয়ে উঠেছে! আমি যেন এখন অকুতোভয়ে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে দুর্দমনীয় বেগে ছুটোছুটি করতে পারি। সেই সঙ্গে এটাও আমি বুঝতে পারলুম যে, আমার প্রাণ এখন দানবের মতন নিষ্ঠুর ও হিংসুক হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা জেনেও

আমার মন দুঃখিত হল না মোটেই! দু-দিকে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে আমার এই তাজা আনন্দটাকে উপভোগ করতে গিয়ে হঠাৎ আমি টের পেলুম, আমার দেহ আকারে আরও ছোট হয়ে গিয়েছে!

তাড়াতাড়ি একখানা বড় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং দেখলুম সেই জীবটাকে সর্বপ্রথমে, তোমরা সবাই যাকে তিনকড়ি বটব্যাল বলে জানো!

পরে আমার এই আকারের ক্ষুদ্রতার কারণ বুঝেছিলুম। আমার ভিতরে যে দুষ্ট প্রকৃতি লুকিয়েছিল, আমার সাধু-প্রকৃতির মতন সেটা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও পূর্ণগঠন হতে পারেনি। আমার জীবনের বেশি দিন কেটেছে সাধুভাবেই, কাজেই এই অসাধু ভাবটা খুব বেশি প্রবল হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়নি কোনওদিনই। এইজন্যেই ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ি বটব্যালের দেহ হয়েছে আরও তরুণ, আরও হালকা ও আরও ক্ষুদ্র! ডাক্তার জয়ন্তের মুখে আঁকা আছে যেমন সাধুতার প্রতিচ্ছবি, তিনকড়ি বটব্যালের মুখের উপরেও ফুটে উঠেছে তেমনি কুৎসিত ভাবের জ্বলন্ত ইতিহাস!

কিন্তু আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমার মনে কোনওরকম ঘৃণা বা লজ্জা হল না। ওই তিনকড়িও তো আর কেউ নয়, ও যে আমিই নিজে! পরে আমি নিজের মূর্তি ধারণ করে অনেকবারই শুনেছি যে, তিনকড়ি বটব্যালের চেহারা দেখে সকলেরই প্রাণে আতঙ্কের উদয় হয়। এর কারণ আর কিছু নয়, সকল মানুষের দেহই ভালোয় ও মন্দে গড়া,–কিন্তু একমাত্র তিনকড়ি বটব্যালেরই দেহ হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে মন্দ দিয়ে গড়া!

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলুম, ডাক্তার জয়ন্তের বাড়িতে তিনকড়ি বটব্যালের ঠাই হতে পারে না। তিনকড়ি যখন মূর্তি ধারণ করবে, তখন তাকে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করতে হবে।

তারপর দ্বিতীয় বার সেই ঔষধ গলায় ঢেলে আবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে করতে আমি নিজের আসল মূর্তি ফিরে পেলুম!

খুব ভেবে-চিন্তে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম। ব্রজদুলাল স্ট্রিটে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে ফেললুম। নিজের চাকরবাকরদের বলে দিলুম যে, তিনকড়ি বটব্যাল বলে কোনও লোক এ-বাড়িতে এলে তারা যেন তার হুকুমকে আমার হুকুম বলেই মনে করে। এমনকী নিজেই তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বার কয়েক এ বাড়িতে এসে আমার এই নতুন চেহারাটা ভৃত্যদের কাছে সুপরিচিত করে তুললুম। ডাক্তার জয়ন্তের কোনও বিপদ হলে তিনকড়িও পাছে বিপদগ্রস্ত হয়, সেই ভয়ে তোমাকে দিয়ে একখানা নতুন উইল তৈরি করিয়ে রাখলুম। এইভাবে আট-ঘাট বেঁধে আমি আমার নতুন জীবনের জন্যে প্রস্তুত হলুম।

অনেকে নিজে নিরাপদে আড়ালে থাকবার জন্যে গুন্ডা ভাড়া করে অন্যায় কাজ করে। কিন্তু আমি হচ্ছি এই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম লোক, আপনাকে নিরাপদে রাখবার জন্যে যাকে অন্যের অন্যায় সাহায্য নিতে হয়নি। ডাক্তার জয়ন্তরূপে সৎ লোকের সমাজে সাধু ভাবে মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে আমি বেড়াতে পারি, আবার ইচ্ছা করলেই চোখের নিমেষে তিনকড়ি সেজে সকলের সামনে যা খুশি তাই করতে পারি। চুরি করি, জুয়াচুরি করি আর নরহত্যাই করি, কেউ আমার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আমাকে দু-মিনিট সময় দাও, একবার পরীক্ষাগারে ভিতরে যেতে দাও–তারপর? তারপর তিনকড়ি বটব্যাল উবে যাবে কর্পূরের মতন! পুলিশ নিয়ে সেইখানে গিয়ে হাজির হও এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দ্যাখো, সেখানে সহাস্য মুখে দাঁড়িয়ে তোমাদের সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করছেন বিখ্যাত ডাক্তার জয়ন্তকুমার রায়, যাঁর সুনাম ও সুচরিত্রের কথা লোকের মুখে-মুখে ফিরছে দিনরাত!

তিনকড়ি রূপে শহরের পাড়ায় পাড়ায় আমি যেসব কাজ করে বেড়াতুম সত্যই তা হীন, নিষ্ঠুর ও ভয়ানক! কোনও মানুষই–যার প্রাণে মন্দের সঙ্গে এতটুকু ভালোও আছে– এমন সব জঘন্য কাজ করতে পারে না! সময়ে সময়ে তিনকড়ির কার্যকলাপ দেখে ডাক্তার জয়ন্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। কিন্তু ক্রমেই এসব ব্যাপার তার কাছে সহজ হয়ে উঠল। এ জন্যে দায়ী তিনি নন, তিনকড়ি একলাই দোষী! জয়ন্ত যখন আকার ধারণ

করেন তখন তার সাধুতার গায়ে তো কোনও আঁচ লাগে না! বরং তিনকড়ি কোনও ভুল করে ফেললে জয়ন্ত নিজের নামের জোরে আবার তা শুধরে নিতে লাগলেন। এই ভাবে তারও বিবেক বুদ্ধি ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে একদিন এক কাণ্ডের পর সদানন্দবাবুর সঙ্গে তিনকড়ির পরিচয়! তারপর যে সব ঘটনা ঘটেছে তোমার তা মনে আছে, আমি তা নিয়ে আলোচনা করব না। কেবল একদিনের কথাই বলব।

একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হল, আমি যেখানে আছি সেখানে থাকা আমার উচিত নয়! ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাড়িই হচ্ছে আমার আসল থাকবার ঠাই, কিন্তু তার বদলে এ যে দেখছি ডাক্তার জয়ন্তের ঘর ও বিছানা,–এ বিছানায় আমি কোনও দিনই তো শয়ন করতে অভ্যস্ত নই!

মনে মনে হেসে খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে এই অদ্ভুত ভাবটা আমি মন থেকে মুছে ফেললুম...হঠাৎ নিজের হাতের দিকে আমার নজর পড়ল। ডাক্তার জয়ন্তের হাত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চ্যাটালো ও মসৃণ! কিন্তু ভোরের অপ্রখর আলোকে আমি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, এ-হাতখানা হচ্ছে মলিন, ছোট, রোগা, দড়ির মতন পাকানো ও কালো কালো লম্বা চুলে ভরা। এ হাত হচ্ছে তিনকড়ি বটব্যালের হাত!

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমার হাতের দিকে নিষ্পলক নেত্রে আমি তাকিয়ে রইলুম! বিস্ময়ের প্রথম চমক কাটার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ এক বিভীষিকার আমার মনটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল– খাট থেকে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে আমি আরশির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কী দেখলুম জানো? আরশির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে তিনকড়ি বটব্যাল! ডাক্তার জয়ন্ত রূপে কাল রাত্রে আমি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, আর আজ সকালে জেগে উঠেছি তিনকড়ি বটব্যাল রূপে! এই অভাবিত পরিবর্তনটা হয়েছে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবং অজ্ঞাতসারেই!

এখন উপায়? পরিবর্তনের কারণের কথা পরে ভাবা যেতে পারে, কিন্তু তিনকড়ি বটব্যাল এখন কী করবে? এ বাড়ি থেকে ও বাড়িতে আমার পরীক্ষাগারে যেতে গেলে অনেকটা পথ পার না হলে নয়। চাকর-বাকররা দেখে ফেললে কী মনে করবে?

তারপরেই বুঝতে পারলুম, তিনকড়িকে এ বাড়িতে দেখে-দেখে সকলে যখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তখন এই অসময়েও তাকে দেখলে তারা বড়জোর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থাকবে। হলও তাই। ও-বাড়িতে যাবার সময় রামচরণ ও অন্যান্য সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আমার চোখ এড়াল না।...দশ মিনিট পরে ডাক্তার জয়ন্ত রূপে আবার আমি নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

সেদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা আমি প্রায় ভুলে গেলুম বললেই হয়। সারাক্ষণই দুর্ভাবনার ভিতর দিয়ে কাটতে লাগল। কারণ কী, কারণ কী? বিনা ঔষধে ডাক্তার জয়ন্তের দেহের ভিতর থেকে তিনকড়ির আবির্ভাবের কারণ কী? অনেক ভেবে আন্দাজ করলুম, ঘন ঘন রূপান্তর গ্রহণ করে আমি বোধহয় ডাক্তার জয়ন্তের চেয়ে তিনকড়ির দেহকেই সবল করে তুলেছি! এখন হয়তো তিনকড়ির মূর্তিই আমার স্বাভাবিক মূর্তি হয়ে ওঠবার উপক্রম হয়েছে!

কিন্তু তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে আমি যতই পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করি, তবু আমার পক্ষেও তাকে পছন্দ করা অসম্ভব। ডাক্তার জয়ন্ত-দেশের ও দশের মাঝখানে সকলেই তাকে সম্মান করে ও ভালোবাসে, তার বন্ধুবান্ধব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সৌভাগ্যের অভাব নেই,আর তিনকড়ি? তাকে এই পৃথিবীর সকলেই নরকের কীটের মতন মনে করে এবং তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবার জন্যে সকলেই প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাকে যদি এই পৃথিবীতে বাঁচতে হয় তবে জয়ন্ত রূপেই বাঁচতে হবে, আর তিনকড়িকে পাঠাতে হবে চিরনির্বাসনে।

মনে-মনে এই দৃঢ় সংকল্প করলুম এবং এ সংকল্প স্থির রইল দুই মাস পর্যন্ত। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, মাঝে দুই মাস আমি সকলের সঙ্গে মন খুলে মেলামেশা

করছিলুম? কিন্তু তার পরেই আবার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। দিন-রাতই আমার হৃদয়কারাগারের ভিতর থেকে তিনকড়ির মুক্তি-প্রার্থনা শুনতে লাগলুম! তারপর আবার এক দুর্বল মুহূর্তে আমি সেই ঔষধ পান করলুম। আমার চরম দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত এইখানেই।

অনেককাল মদ্যপান বন্ধ রেখে মাতাল যদি আবার নতুন করে মদ্যপান শুরু করে, তাহলে সে আর নেশার মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। আমারও অবস্থা হল সেই রকম। এতদিন আমার দেহহীন অসাধু প্রকৃতি যে নিষ্ফল আক্রোশে ও অবরুদ্ধ আবেগে নীরবে হাহাকার করছিল, আজ আবার নতুন করে দেহ ও স্বাধীনতা লাভ করে সে একেবারে দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। তিনকড়ির মূর্তি ধারণ করে বিরাট এক পৈশাচিক উল্লাসে ও ভীষণ এক হিংসাপূর্ণ আনন্দে আমার সমস্ত দেহ-মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! সেই সময়েই হতভাগ্য কুমার মনোমোহনের সঙ্গে আমার দেখা। এবং তার পরিণাম তোমরা সকলেই জানো। ...মনোমোহনের অচেতন দেহকে অসহায়ভাবে পথের ধুলোয় পড়ে থাকতে দেখেও আমার মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হল না–আমি তার ওপরে লাঠির পর লাঠির ঘা মারতে লাগলুম এবং যতবারই লাঠি মারি ততবারই আমার বুক তাণ্ডবের আনন্দে যেন নাচতে থাকে! মারতে-মারতে আমার অন্ধ আনন্দ হঠাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলে! আচম্বিতে মনে পড়ে গেল, আমি এখন হত্যাকারী, ধরা পড়লে এখন আমার জীবনের কোনওই দাম নেই! বিষম আতঙ্কে আমার উন্মত্ত আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল–তিরের মতন সেখান থেকে পলায়ন করলুম।

ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে তিনকড়ি যখন নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার জয়ন্তের পরীক্ষাগারে ফিরে এল, তখন সে মহা ফুর্তিতে একটা টপ্পা গান শুরু করে দিলে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে হাসিমুখে সে ঔষধ পান করলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ধারণ করলেন ডাক্তার জয়ন্ত! কিন্তু তার মুখে তখন আর হাসি ছিল না, তার চোখে ছিল অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস।...অনুতাপে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল, আবার তিনকড়ি হয়ে আমি কী গুরুতর পাপই আজ করলুম! আর নয়–আজ থেকে তিনকড়ির

সমাপ্তি! হে ভগবান, এ বন্যপশুকে আর কখনও পিঞ্জরের বাইরে আনব না,কখনও নয়, কখনও নয়!

অবিনাশ, তুমি জানো সেই হত্যাকাণ্ডের পরে আমি কীভাবে জীবনযাপন করেছি? তোমাদের সঙ্গে আলাপ, ধর্মালোচনা ও পরোপকার ছাড়া আর কোনওদিকেই আমি মনকে নিযুক্ত রাখিনি। সমস্ত অন্যায় আনন্দকে আমার মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি আমার সাধুপ্রকৃতির ভিতর থেকে শান্তি ও সুখের খোরাক খুঁজে পেলুম এবং ধীরে ধীরে আমার মন থেকে অনুতাপের ভাবটা আবার মিলিয়ে গেল।

কিন্তু তারপর থেকেই বুকের ভিতরে নিত্যই আমার অসাধু প্রকৃতির গর্জন আবার শুনতে পেলুম! কে যেন রুদ্ধস্বরে বলছে-ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও-তোমার ভালোকে নিয়ে তুমি থাকো, আমাকে নিজের পথে যেতে দাও! এত সাধুতা আমার সইছে না! যদিও নরকের উৎকট আনন্দ বারে বারে আমাকে ডাকতে লাগল, তবু সে প্রলোভনকে প্রাণপণে আমি দমন করতে লাগলুম। তিনকড়ির জাগরণ আর অসম্ভব! এবার জাগলে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

সেদিন সকালে এক কোম্পানির বাগানে একটি বসেছিলুম। কচি রোদের সোনার জলে গাছের সবুজ পাতাগুলি ঝলমল করছে, চারিদিকে পাখিদের প্রভাতি বীণার গান শোনা যাচ্ছে, আকাশের উদার নীলিমায় মেঘের ছায়া নেই। এই শান্ত প্রভাতে আমার মনের ভিতর থেকে হারানো সুখস্মৃতির কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস জেগে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের ওপরে যেন কীসের একটা ধাক্কা লাগল! মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল এবং চোখের সুমুখ দিয়ে একটা অন্ধকারের বন্যা ছুটে গেল! তারপরই দেহের ভিতরে অনুভব করলুম, নবীন যৌবনের উদ্দাম আবেগকে! হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলুম; আমার জামা-কাপড়গুলো ঢিলে হয়ে দেহের ওপর থেকে ঝুলে পড়েছে এবং আমার দুই হাঁটুর ওপরে আছে দুখানা পাকানো লোমশ হাত! আবার আমি তিনকড়ি বটব্যাল! এক মুহূর্ত আগে ছিলুম আমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও বরেণ্য এবং এক মুহূর্ত পরেই হলুম সমাজ থেকে বিতাড়িত কঁসির আসামি!

কিন্তু এখন ভাববার বা ভয় পাবারও সময় নেই। আমার ঔষধ আছে পরীক্ষাগারের ভিতরে, কিন্তু সেখানে যাব কেমন করে? তিনকড়িরূপে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করলে আমার ভৃত্যরাই এখন পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দেবে। তাহলে কী করি?...তখন মনে পড়ল করুণাকে। বাগান থেকে বেরিয়ে আসছি, একটা বুড়ি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ডালায় কতগুলো দেশলাইয়ের বাক্স। বুড়ি ভিখারির মতো স্বরে কাকুতি মিনতি করে বললে, বাবা, একবাক্স দেশলাই কিনবে বাবা? অকারণে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল এবং বুড়ির মুখে আমি সজোরে চপেটাঘাত করলুম। হাউমাউ করে কেঁদে ককিয়ে বুড়ি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকলুম। আমার চেহারা ও কাপড়-চোপড় দেখে গাড়োয়ান তার হাসি চাপতে পারলে না। দুর্জয় ক্রোধে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আমি গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখলুম–এবং তার ঠোঁট থেকে হাসির লীলা তখনই মিলিয়ে গেল। সে শিউরে উঠে ফিরে বসে তাড়াতাড়ি নিজের কাজে মন দিলে। ভালোই করলে, নইলে সে বাঁচত না।

একটা হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলের চাকরগুলোও আমার চেহারা দেখে গেল চমকে ও ভড়কে। আবার আমার সেই খুনে-রাগ হতে লাগল, কিন্তু কোনওরকমে রাগ সামলে একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। সেইখানে বসে করুণাকে একখানা ও আমার ভৃত্য রামচরণকে একখানা পত্র লিখলুম। তারপরের কথা এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ, সুতরাং আমি আর বলবার চেষ্টা করব না।

...নিরাপদে নিজের বাড়িতে ফিরে এলুম বটে, কিন্তু তারপর থেকে জীবন আমার দুর্বহ ও দুঃসহ হয়ে উঠল। দুপুরবেলায় নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে দিবা-নিদ্রার একটু আয়োজন করছি, এমন সময়ে আমার প্রাণের ওপরে আবার সেইরকম একটা ধাক্কা লাগল। এবারে আগে থাকতেই সাবধান হলুম। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতপদে

পরীক্ষাগারের দিকে ছুটলুম। পরীক্ষাগারের দরজা বন্ধ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আবার আমি তিনকড়ি হয়ে গিয়েছি!

এবারে খুব বেশিমাত্রায় ঔষুধ খেয়ে নিজের আগেকার মূর্তিকে ফের ফিরে পেলুম বটে– কিন্তু বৃথা! খানিক পরে আবার আমার প্রাণকে ধাক্কা মেরে তিনকড়ির পুনরাবির্ভাব হল! তারপর যতই ওষুধ খাই ও জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করি, তিনকড়ি আর কিছুতেই আমাকে ছাড়ে না, একটু আনমনা হলেই সে এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসে!

তারপর আমার ওষুধ গেল ফুরিয়ে! নিজে নানা কৌশলে আত্মগোপন করে রামচরণকে অনেক ডাক্তারখানায় পাঠালুম, কিন্তু সে সর্বনেশে ওষুধের গুড়ো আর কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না! দেখছি, তিনকড়ির ভূতকে ঘাড়ে করেই জীবনের শেষনিশ্বাস আমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ওষুধের সামান্য একটুখানি অবশিষ্ট ছিল, তারই প্রভাবে শেষবারের জন্যে জয়ন্তের মূর্তি ধারণ করে তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। অবিনাশ, আর আমার কোনও আশাই নেই। তিনকড়ির কী হবে? সে কি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেবে? ভগবান জানেন! আমার আর কিছুই জানবার আগ্রহ নেই। আমার যথার্থ আমিত্বের মৃত্যু হয়েছে, তিনকড়ির অদৃষ্টের সঙ্গে তার কোনওই সম্পর্ক নেই। তোমাকে চিঠি লিখে যখন আমি কলম তুলে রাখব, তখন থেকেই এই পৃথিবী হতে অভাগা জয়ন্তের জীবন একেবারেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।